পাপ অপাপ

পাপ অপাপ

গৌতম রায়

নবসাহিত্য প্রকাশনী
১২৮/১ এ, রাজা রামমোহন সরণি
কলিকাতা-৯

বার দুয়েক ডোরবেলের নবে আঙুল ঠেকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সুমন। গেটের বাইরে থেকেই শোনা গেল ডিংডং ডিংডং। আশপাশটা একবার ভালো করে তাকিয়ে নিল। বার কয়েক যাতায়াত না থাকলে ঠিকানা মিলিয়ে সল্ট্‌লেকের বাড়ি খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন। সুমনের কয়েকবার এদিকে যাতায়াত করা ছিল। ফলে বিবি ব্লকে কস্তুরী সান্যালের বাড়িটা পেতে ওকে বিশেষ পরিশ্রম করতে হয়নি। তাছাড়া কস্তুরী সান্যাল নামটা মোটামুটি পরিচিত নাম। একজনকে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি সঠিক নির্দেশ দিয়ে দিয়েছিলেন।

দুদিন ধরে একটা কথাই সুমনকে বেশ ভাবাচ্ছিল। তার মতো নগণ্য এক কল্কে না পাওয়া ছোকরাকে হঠাৎ কস্তুরী সান্যাল দেখা করতে বলে এলেন কেন?

গত পরশু ওদের শো ছিল শিশির মঞ্চে। সম্ভবত ওটাই আপাতত শেষ শো। 'শরশয্যায় ভীষ্ম'। না, কোন পৌরাণিক নাটক নয়। একটি সৎ মানুষ, আপাত কলঙ্কহীন নির্ভিক মানুষ কেমন করে স্বার্থসর্বস্ব, দুর্নীতিবাজ সামাজিক পরিস্থিতির শরাঘাতে জর্জরিত তারই এক সমাজ চেতনার নাটক। সুমনই নাট্যকার, নির্দেশক। আপ্রাণ চেষ্টা করেছে একটি বলিষ্ঠ এবং সত্যনিষ্ঠ বক্তব্যকে তুলে ধরতে। কোনরকমে টেনেটুনে ধার দেনা করে দশটা শো করার পরেই ছোটার নেশাটা মুখ থুবড়ে পড়ে যাবার মুখে। আপোষহীন সংগ্রামের নাটক। সস্তা সুড়সুড়ি দিয়ে জনমনোরঞ্জনের কোন অবকাশই নেই। বলিষ্ঠ বক্তব্য, বলিষ্ঠ উপস্থাপনা। নাটক শেষ হলে লোকে বাহবা দিয়েছে। বলেছে আজকের দিনে এমন নাটকই তো দরকার। উৎসাহের দানাপানি পেয়ে সুমনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ঘোড়াটা আরো তেজী হয়েছে। কিন্তু ভাঁড়ের কড়ি এখন ধারে টইটম্বুর। শুধু পুশ সেল করে আর ট্যাঁকের কড়ি নিঃশেষ করে গ্রুপ বাঁচানো সম্ভব নয়।

পরশু শো দেখতে গিয়েছিলেন কস্তুরী সান্যাল। শো শেষ হয়ে যাবার পর মেকাপ তুলছিল সুমন। হঠাৎ একটা চাপা গুঞ্জনে মুখ ফিরিয়ে দেখে কস্তুরী সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

কস্তুরী সান্যালের নামটা ওর আগেই শোনাছিল। ভদ্রমহিলার

সেলিব্রিটি আছে। গুণ, অর্থ, রূপ কোনটাই কম নয়। যেমন রূপ আছে। রূপের দেমাকও আছে। আবার ব্যক্তিজীবনে কিছু গসিপও আছে। তবে এই ধরণের মহিলার কিছু গসিপ থাকলেও কারও কিছু বলার নেই। বললেও মহিলার তা নিয়ে কোন মাথা ব্যথাও নেই।

কস্তুরী যুগ্ম অর্থেই শিল্পী। এককালে তিনি দারুণ সব ছবি আঁকতেন। একবার সুমন অ্যাকাডেমিতে ওঁর একক ছবির প্রদর্শনী দেখে এসেছে। ভালো ছবি। দেখার ছবি। গভীর অনুভূতির ছবি। সুমনের বেশ ভালো লেগেছিল। যদিও ও নিজে ছবিটবি আঁকতে জানে না। ছবির পশরা নিয়ে কস্তুরী বেশ কয়েকবার প্যারিস লণ্ডন ঘুরে এসেছেন। না আসার কোন কারণও নেই। মধ্য বয়েসী এই সুন্দরী মহিলাটি বর্তমানে এক বিজনেস ম্যাগনেট সঞ্জীব সান্যালের স্ত্রী। সেই কস্তুরী ছবি আঁকার ফাঁকেই বেশ কিছুদিনের জন্যে চলে এসেছিলেন নাটকের জগতে। সেখানেও বাজীমাৎ। পেশাদারী মঞ্চে এবং সিনেমায় হিরোইন হিসেবে বেশ নামটাম করে নিয়েছিলেন। কিন্তু প্রচণ্ড খামখেয়ালী, দেমাকী এবং একগুঁয়ে মহিলা কোন এক অজ্ঞাত কারণে হঠাৎই সিনেমা থিয়েটার বন্ধ করে দিয়েছেন। কারণটা সুমনের জানা নেই। জানান কোন ইচ্ছেও সেই। নিন্দুকেরা বলে তিনটে ছবি ফ্লপ, তারপরই ও লাইনে ইস্তফা।

সেই কস্তুরী সান্যাল শো এর শেষে দেখা করে, নিজের কার্ড রেখে বলে এসেছিলেন খুব শীগগিরই যেন সুমন তার সঙ্গে দেখা করে। দরকারটা জরুরী। প্রথমটা ও দোনামোনা করেছিল। শেষ পর্যন্ত বিপুল আর সুনীতের চাপে পড়ে ওকে চলে আসতে হয়েছে সল্টলেকে।

সুমন একবার হাত ঘড়িটা দেখল, ঘড়ির কাঁটা বারোটার ঘরে। গরমকাল হলেও তেমন কোন অসুবিধা হয়নি। এদিকে প্রচুর গাছপালা থাকায় হাঁফধরা গরমটাও তেমন লাগেনি।

আর একবার 'নবে' আঙুল ছোঁয়াবে কিনা যখন ভাবছে, ঠিক তখনই বছর পঞ্চাশের একটি লোক এসে দরজা খুলে দাঁড়ালো। আপাদমস্তক দেখে সুমন অনুমান করে নিল, লোকটি বাড়ির কাজের লোক হওয়াই স্বাভাবিক।

কোন রকম ভনিতা না করে সুমন বলল, কস্তুরী দেবী বাড়ি আছেন?

—হ্যাঁ আছেন। কিন্তু আপনি?

—বলুন পরশু যাকে শিশিরমঞ্চের গ্রীনরুমে ইনভাইট করে এসেছিলেন, তিনিই এসেছেন।

লোকটি চলে যাচ্ছিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, নাম কী বলব?

—সুমন সেন।

—ঠিক আছে। আপনি ভেতরে বসুন। ডেকে দিচ্ছি।

সুমন লোকটির পিছন পিছন এগিয়ে গেল। সুখ আর সমৃদ্ধিতে ভরপুর। মেঝেয় পুরু দামী কার্পেট। আরো দামী কাপড়ে মোড়া সোফাসেট। সামনে কাচের টিপয়। বেশ কিছু সিনেমা সংক্রান্ত ম্যাগাজিন। ঝকঝকে তকতকে হাল্কা অলিভ গ্রীনের দেওয়াল। দেওয়ালে একটিই মাত্র ছবি। বিশালাকার পেণ্টিংস। সম্ভবত কস্তুরী সান্যালেরই আঁকা। স্বাস্থ্যগত অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টির তাগিদেই হোক সাজানো ঘরটির চারদিকে নানান জাতের পাতাবাহারি গাছ।

সুমন যতই কেন পোড়াখাওয়া আর গ্রুপ থিয়েটার করা ছেলে হোক একটু আড়ষ্টতায় মনে মনে কোনঠাসা হচ্ছিল। চকিতে একবার নিজের পারিবারিক চেহারাটা মিলিয়ে নিল। সেখানে অসংগতির চূড়ান্ত। পকেটে হাত দিয়ে সিগারেটের প্যাকেটটার অস্তিত্ব অনুভব করে নেয়। ধরাবে কি ধরাবে না এই দোটানার মধ্যে সারা ঘরে মনমাতানো পারফিউমের স্নিগ্ধ ঢেউ তুলে মোজাইকের সিঁড়ি বেয়ে তরতরিয়ে নেমে এলেন কস্তুরী সান্যাল। মুখে প্রচ্ছন্ন অহমিকা মেশানো মিস্টি হাসির রেশ।

সামনের লম্বা সোফায় বসতে বসতে কস্তুরী বললেন, আমি তো ভাবলাম আপনি আর এলেনই না।

—কেন, আসার জন্যে সময়টা কী বেশী নিয়ে ফেলেছি? মানে মাত্র একটা দিনই কেটেছে।

—হ্যাঁ, তাও বটে! নিশ্চয় খাওয়া দাওয়া করে আসেননি?

আড়চোখে একবার কস্তুরীর দিকে তাকিয়ে নিয়ে সুমন বলল, আমাদের জন্যে খাওয়ার কোন সিডিউল টাইম থাকে না। কেন

আপনি খাওয়াবেন নাকি ?

—সে তো খাওয়াবই। আপনি আমার গেস্ট। ঠিক আছে এখন একটু ছোট করে খান। তারপর বড়োটা।

—বড়োটা মানে? আপনি কি দুপুরের খাওয়ার কথা বলছেন ?

—আপত্তি আছে ?

—সংকোচ আছে ?

—কি রকম ?

—কোন সুন্দরী মহিলার সামনে বসে তো এর আগে জমিয়ে খেতে বসিনি। অবশ্য বাড়িতে বৌদি আছে। সুন্দরী। তবে সেটা অন্য ব্যাপার। কিন্তু এখানে, প্রথমত অপরিচিতির অস্বস্তি দ্বিতীয়ত আদব কায়দার ঠ্যালা। অত সব এথিক্স্ মেনে খাওয়া, এটার আগে ওটা, ওটার পরে সেটা। খাওয়া নয়, সংকোচ গিলতে হবে।

—নো প্রবলেম। আপনি আপনার মতোই হাত চালাবেন। ফর্মালিটির কোন ব্যাপার নেই।

—ভালো। একটা সিগারেট খেতে পারি ?

—স্যরি। আমার নিজেরই অফার করা উচিত ছিল, বলেই টিপয়ের নিচের তাকে রাখা ইণ্ডিয়া কিংসের প্যাকেট আর একটা সুদৃশ্য লাইটার তুলে দেন।

—ওহ্ বাবা। এসব সিগারেট দোকানে সাজিয়ে রাখতে দেখেছি। তখন ভাবতাম এসব কারা কেনে রে বাবা। চলবে না ম্যাডাম। একবার খেয়ে মরি আর কি ?

—কেন মরবার কী হয়েছে ?

—পয়সা থাকে না বলে বিড়ি ফুঁকতে হয়। তাও আপনার এখানে আসব বলে মদনের দোকান থেকে ধারে নিয়ে এসেছি। চার্মস। ইণ্ডিয়া কিংস খেলে জিভের টেস্ট নষ্ট হয়ে যাবে। থ্যাঙ্কস্ ফর ইওর প্রেসাস অফার।

সুমন চার্মসই ধরায়। কস্তুরী মৃদু হেসে উঠে দাঁড়ান, চা না কফি ?

—গরমের দিনে কফি তেমন জুত হবে না। আপনি চা-ই বলুন।

কস্তুরী মৃদু হাসি মুখে নিয়ে চলে যান।

মহিলার পিছন ফিরে চলে যাওয়াটা দেখতে দেখতে সুমন ভাবে, কত বয়েস হবে কে জানে। তবে ফিগার যা রেখেছেন অনেক পুরুষেরই মুণ্ডু ঘুরে যাবে। কিন্তু ইনি নাকি বিজনেশ ম্যাগনেটের স্ত্রী। সিঁদুর-টিঁদুর কোথাও নেই। এই দুপুর বারোটাতেও সাজের ঘটা যা, উইদাউট মেকাপে এখনই স্টেজে নামিয়ে দেওয়া যায়। শরীরের দুরন্ত যৌবন রেখার দৌলতে, আর দেহের মাখন মাখন মসৃণতা এবং চাঁপাকলির রঙে ইনি এখনও নায়িকা হ'তে পারেন। এরা যে কীভাবে ফ্লপ্ করে কে জানে! তাও একটা ছবি নয়। পর পর নাকি তিনটে ছবি। সুমন মনে মনে বলে শালা এরকম সুযোগ যদি আমরা পেতাম···।

—কী ভাবছেন মাথা নিচু করে? গভীর কিছু?

সত্যিই সুমন অনেক কিছুই ভাবছিল। ভাবছিল টাকার অভাবে তার দলটা বোধহয় এবার উঠেই যাবে। আর এখানে অর্থের ছড়াছড়ি। আরো ভাবছিল গ্যাস ট্যাস দিয়ে এই শাঁসালো মহিলাকে যদি চীফ্ পেট্রন করা যায় তাহলে দলটা কিছুদিনের জন্যে অন্তত দু একটা শো করতে পারে। কস্তুরীর গলা পেয়ে সুমন মাথা তুলল। এক ট্রে স্ন্যাক্স্ আর ধূমায়িত চা নিয়ে পেছনে দাঁড়িয়ে আছে পরিস্কার জামা আর পাজামা পরা বাড়ির কাজের লোকটি। লোকটিকে দেখতে দেখতে সুমনের মনে হল নিজের বাড়িতে সে এর থেকেও খারাপ জামা কাপড় পরে থাকে। মনে মনে বলল, উঃ শালা, আমরা দারিদ্রসীমার কত ফুট নিচে আছি কে জানে।

—আর ভাবতে হবে না খেতে আরম্ভ করুন। সুকুমার, তুমি এখন যাও। পরে এসে কাপ ট্রে নিয়ে যেও।

লোকটি চলে গেল। কস্তুরী আগের মতোই সামনের সোফাটায় বসে জিজ্ঞাসা করলেন, চা'ই এনেছি। ক চামচ চিনি?

—যত পারেন। রেশনে চিনি দিচ্ছে না বেশ কয়েক হপ্তা। এখন যতটা পারি স্টোর করে নিই।

হাসতে হাসতে কস্তুরী পরিমাণ মতো চিনি মিশিয়ে চায়ের কাপটা এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, চিনি তো ওভাবে স্টোর করা যায় না, বরং রক্তে চিনি বাড়ার সম্ভাবনা থেকে যায়

জবাবে সুমন বলে, সেটা আরো ভালো ব্যাপার। তাহলে আর চিনির জন্যে হা পিত্যেশ করতে হবে না। তবে এই বয়েসে ব্লাডসুগার! ধ্যাৎ, এইতো খাবার বয়েস। যত সুগার তত লাবণ্য। যাক, এবার বলুন তো ম্যাডাম, হঠাৎ আমাকে ডেকে পাঠানোর কারণ? আমি তো কেউকেটা কেউ নই?

চায়ের কাপে আলতো করে গোলাপী ঠোঁট ছুঁইয়ে কস্তুরী বলেন, কেউকেটা দেখতে দেখতে আমার চোখ হেজে গেছে। প্রতিমা দেখেছেন তো, ওপরেই সাজসজ্জার বাহার কিন্তু পলেস্তারা খসে গেলেই খড় আর মাটি।

টুক্ করে কথা কেড়ে নিয়ে সুমন বলে, তার মানে কী আপনি এই বোঝাতে চাইছেন, এই যে আপনার সাজানো ফ্ল্যাট, ঝকঝকে দেওয়াল, চকচকে পরিবেশ, সামান্য একটা আঁচড়েই এগুলো সব অদৃশ্য হয়ে যাবে?

—যেতে পারে যদি না সাজানোর রসদটা ঠিকমতো জোগান দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। এনিওয়ে, ফিলজফি বাদ দিয়ে লেট আস কাম টু আওয়ার বিজনেস পয়েণ্ট।

—বিজনেস? কিসের বিজনেস? ডু ইউ ওয়াণ্ট টু মেক মী ইওর বিজনেস পার্টনার? আমার পকেটে ফেরার গাড়ি ভাড়াটা আছে। ব্যাঙ্কে নিজের নামে কোন অ্যাকাউণ্ট নেই। নিয়ার ফিউচারে হবে তেমন কোন স্বপ্ন দেখতেও ভয় পাই।

—ওয়েল, আপনার সম্বন্ধে এত কিছু চিন্তা করে আপনাকে কিন্তু আসতে বলিনি।

—বেশ, তাহলে কাজের কথাই বলুন।

—আপনার হাইট কতো?

—কি গ্যাঁড়াকল, আমি তো মেপে আসিনি। হাইট, ওয়েট, প্রেসার, এসব কে মাপে? রুগী আর বড়লোকেরা।

—তবু একটা আন্দাজ?

—আপনিই আন্দাজে বলুন না।

—ছয়? এক দু ইঞ্চি বেশীও হতে পারে। স্টেজে কিন্তু আপনাকে বেশ লম্বাই লাগে।

—হবে হয়তো।

—ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড, না আমাকে লজ্জা পাবারও কিছু

নেই, একটু উঠে দাঁড়ান।

—দাঁড়াচ্ছি। কিন্তু প্লেটে এখনও অনেকগুলো সুখাদ্য রয়ে গেছে।

—ওগুলো পালাবে না। দাঁড়ান।

সুমন সোজা হয়ে দাঁড়াল। কস্তুরী একবারে ওর পাশে গিয়ে নিজের মাথার ওপর বিঘৎ মাপ নিয়ে ফিরে এসে বলেন, ঠিক তাই। এবার শার্টটা খুলে ফেলুন।

—'মাই গড্', বলে সুমন কোচের ওপর ধপ্ করে বসে পড়ে।

—কি হল, দেখে তো খুবই স্মার্ট মনে হয়। কথাবার্তাও সরেস। তা জামাটা খুলতে এত লজ্জা কেন? আমি মহিলা বলে?

—ঠিক তাই।

—কিন্তু স্টেজে দরকার পড়লে কয়েকশো লোকের সামনে খালি গায়ে দাঁড়াতে কী খুব অসুবিধা হবে?

—এটা তো স্টেজ নয় এবং কয়েকশো দর্শকও নেই। মাত্র একজন মহিলা এবং এটি তাঁর নির্জন পারলার।

—সাটাপ! এবার সামান্য ধমকের সুর কস্তুরীর গলায়, আমি আপনার থেকে বয়েসে অনেকটাই বড়ো। অত লজ্জা পাবারও কিছু নেই। কারণটা একটু পরে যখন শুনবেন তখন বুঝবেন আপনাকে অপদস্ত করার জন্য জামা খোলাতে চাইছি না।

সুমন আর কিছু না বলে তার অলওপন চাইনীজ শার্টটা খুলে ফেলে। বেরিয়ে আসে ছাব্বিশ বছরের একটি স্বাস্থ্যবান যুবকের সুঠাম শরীর। কস্তুরীর চোখে ফুটে ওঠে প্রশংসার দীপ্তি, আপনি কী ব্যায়াম ট্যায়াম করেন?

—জামাটা পরে নিতে পারি?

—সিওর। আমার কথার উত্তর দিলেন না তো?

—আপনি পায় না শঙ্করাকে ডাকে। ব্যায়াম করতে গেলে নিদেনপক্ষে ছোলা আর বাদাম ভেজা খাওয়া দরকার। সেটা জোগাতে আবার নতুন ভাবনা শুরু করতে হবে। না ম্যাডাম, ওসব দেহচর্চা বিলাসের বিলাসীতা আমার নেই। বোধহয় আমার

স্বাস্হ্যটা জিনের এফেক্ট। আমার বাবা ছিলেন হেভি স্বাস্থ্যবান ভদ্রলোক।

—নাটক করা ছাড়া আপনি আর কী করেন?

—সকালের দিকে গোটা দুয়েক টিউশনি করি। তবে যে হারে কামাই, কোনদিন না ঠ্যাঙানি দিয়ে ঘরের ছেলেকে ঘরে পাঠিয়ে দেয়।

—কিন্তু নাটকের দলেও তো আপনাকে কিছু কনট্রিবিউট করতে হয়।

—আমি নাট্যকার, পরিচালক এবং অভিনেতা। গ্রুপ আমার ক্ষেত্রে কিছু কনসিডার করেছে। তবে টিকিট বিক্রি করে সেটা উসুল করে দিতে হয়। প্রতি শো-য়ে তো আর একই লোকের কাছে টিকিট গছানো যায় না। একবার আমার বাড়ির পাশে এক ওড়িয়া বামুনকে টিকিট গছিয়েছিলাম ওড়িয়া নাটক হচ্ছে বলে। তো সেই নাটক দেখার পর সে আমার বাড়ি এসে কেবল জুতো মারা ছাড়া মুখে যত কিছু বলা যায় সব বলে টিকিটের দাম ফেরৎ চেয়েছিল। অবশ্য কোনরকমে সে যাত্রা বেঁচে গেছি। আমাদের পরের শো-এর একটা টিকিট কাটুন না ম্যাডাম।

ম্যাডাম হো হো শব্দে হেসে উঠলেন।

—হাসছেন। কিন্তু নাটকটা দেখলে বুঝতেন, বলেই সুমন নিজেই হো হো করে হেসে উঠে বলল, যাঃ শালা, ঐ নাটক দেখতে গিয়েই তো আপনার আমন্ত্রণ পেলাম। নাঃ আমার মাথাটাই গেছে!

—চাকরি করবেন?

—কে দেবে? আপনি?

—ধরুন তাই!

—কিন্তু আমি অর্ডিনারী গ্র্যাজুয়েট।

—নো প্রবলেম। আমার চাকরিতে ওতেই চলবে।

—চাকরিটা কী?

—মডেলিং।

—তার মানে?

—তাহলে খুলেই বলি। আমার একটা পাবলিসিটি ফার্ম আছে। কস্তুরী অ্যাড এজেন্সী। এনটায়ারলি আমার।

ইভ্‌ন্‌ নো পার্টনারশিপ উইথ মাই হাজব্যান্ড। বিভিন্ন কোম্পানীর বিজ্ঞাপনের দায়দায়িত্ব আমাকে নিতে হয়। অর্থাৎ তাদের ব্যবসাকে বাড়াতে আমাকে মানে আমার কোম্পানীকে তৎপর হতে হয়।

—বুঝলাম। তা এখেনে আমি কোন্‌ কম্মে লাগব ?

—বলছি। তার আগে আমার কথাগুলো মন দিয়ে শুনুন। এতোদিন আমাদের কাজ ছিল পেপার অ্যাড, সিনেমা স্লাইড, হোর্ডিং, পোস্টার পাবলিসিটি ইত্যাদি। কিন্তু এখন ধারা বদলাচ্ছে। মিডিয়াও বদলাচ্ছে। এখন পার্টিরা ঝুঁকেছে টেলি-মিডিয়ার দিকে। ন্যাচার্যালি আমাদেরও সেই দিকে এগোতে হচ্ছে। রিসেন্টলি একটা বড়ো পার্টি এসেছে আমাদের হাতে। সফ্‌ট ড্রিংকসের বিজ্ঞাপন। তার জন্যে দরকার একটি হ্যান্ডসাম এবং ম্যানলি ফিগার। যেটা আপনার আছে।

—তাই বলুন। তা আমাকে কি করতে হবে।

সেটা আমাদের শ্যুটিং ডিরেক্টরের কাজ। তিনি যেভাবে স্ক্রিপ্ট্‌ করবেন সেই ভাবেই আমাদের শ্যুটিং হবে ?

—তারপর লোকে যখন প্যাঁক দেবে ?

—কি দেবে বললেন ?

—স্যরি। ওটা আমাদের কোড ল্যাঙ্গুয়েজ। আসলে আমি বলতে চাইছিলাম, আপনার হয়ে আমি একটা মিনিট খানেকের বিজ্ঞাপনে মডেলিং করলাম। তারপর আমায় ছুটি করিয়ে দিলেন। আমার অবস্থাটা কী দাঁড়াবে ?

—কি দাঁড়াবে মানে ?

—ধরুন টিভি বিজ্ঞাপন। বারবার বোকাবাক্সে মুখ ভেসে উঠবে। একসঙ্গে কয়েকলাখ করে লোক দেখবে।

—তো ?

—লোকে ভেবে নেবে আমি খুব বিগগাই। মুখটাও অনেকে চিনে রাখবে। এলিতেলিরা ভাববে আমার বেশ মালকড়ি আছে। আবার তারাই দেখবে ছেঁড়া চটি লটাস পটাস করতে করতে আমি ট্রামে বাসে গুঁতোগুঁতি করছি। তখন না হোমে না যজ্ঞে। না হবে না। একদিন কা সুলতান হয়ে কোন আখের নেই।

—এক মুহূর্তে এতো কিছু ভেবে নিলেন ? আগেই বলেছি

এটা আপনার চাকরি। আপনার সঙ্গে আমার আই মীন আমাদের কস্তুরী অ্যাড এজেন্সীর কনট্র্যাক্ট থাকবে। শুধু বিজ্ঞাপনের মডেল না, আরো অন্য কাজেরও আমাদের প্ল্যানিং আছে। তখন অভিনেতা সুমন সেনকে আমাদের দরকার পড়বে।

সুমন মাথা নিচু করে কিছু ভাবতে থাকে। আসলে সে ভাবছিল ব্যাপারটা ঠিক কী হ'তে চলেছে। এটা কী তার জীবনের একটা ব্রেক? নাকি ঝামেলাদায়ক প্রফেশানে মাথা গলিয়ে দিয়ে শেষ কালে হাবুডুবু খাওয়া?

—কী ভাবছেন, কস্তুরী তাগাদা দেন।

—এতো লোক থাকতে আমায় নিয়ে পড়লেন কেন বলুন তো?

—কারণ আপনার ফিগারটা লোভনীয়। তারপর আপনি ভালো অ্যাকটিং জানেন। এ কাজে এই দুটোরই খুব প্রয়োজন। আরো বলছি, আপনার মুখের একস্‌প্রেশনগুলো দারুন। যেটা অনেকের মধ্যেই থাকে না।

—তারপর?

—বেশী পরের কথা ভাবলে এগুতে পারবেন না। আপনি কি জানেন আজকাল কত হাই ফ্যামিলির মেয়েরা মডেলিং করতে এগিয়ে আসছে। কত মেয়ে এই ভাবে রোজগার করে ফ্যামিলি চালাচ্ছে। আর ছেলেরা? তারা পকেট থেকে টাকা ঢেলে বিজ্ঞাপনের মডেল হ'তে চায়। কিনা, ওইভাবে মুখ দেখাতে দেখাতে যদি কোন দিন ফিল্‌মে চলে আসতে পারে। ইউ আর লাকি এনাফ যে আপনাকে দেখেই আমার মনে ধরে গেছে।

টেরচা চোখে সুমন একবার কস্তুরীর দিকে তাকিয়ে নেয়।

— আমি বলছি শুনুন, সবাই এ সুযোগ পায় না। আপনার লাইফ স্টাইলটাই পাল্টে যাবে। আজ একটা শো করার জন্যে আপনাকে দরজায় দরজায় ঘুরতে হচ্ছে। এ দিকটাও তো পাল্টে যেতে পারে।

—আমাকে দুটো দিন ভাবতে দিন।

—কেন? কারো পারমিশান নেবার দরকার আছে?

—গ্রুপে একবার কথাটা পাড়তে চাই।

—গ্রুপ, গ্রুপ আর গ্রুপ। সুমনবাবু, আমি আগেই বলেছি

তোমার থেকে আমার বয়েসটা কিছু বেশী। আমিও একদিন নাটক করেছি। সিনেমা করেছি। সেই অর্থে দল অবশ্য করিনি। কিন্তু দলের চেহারাগুলো আমি জানি। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে টাকার অভাবে দল চলে না। আবার দলের মাথাদের কেউ কেউ যদি ফিল্মে চলে আসতে পারে তখন তাদেরই জন্যে দল উঠে যায়। কখনো আবার একটি মেয়েকে কেন্দ্র করে, বাই দ্য বাই, তেমন কেউ আছে নাকি তোমার? তুমি বলছি বলে রেগে যাচ্ছ না তো?

—না। বয়েসে তো আপনি বড়োই। তবু আমি দুদিন সময় চাইছি।

—ওয়েল। কিন্তু বললে না তো, তেমন কেউ আছে নাকি তোমার। যদিও এটা তোমার একান্তই ব্যক্তিগত জীবন।

সুমন সামান্য অন্যমনস্ক হল। মনে পড়ে গেল অহনার মুখটা। অহনা। মাত্র কয়েকমাস আগে শেষ দেখা একটি রাগী মেয়ের মুখ। প্রচণ্ড অপমানে যে তাকে একরকম তাড়িয়েই দিয়েছিল। ঠিক এই সময়ে এই রকম একটা প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে অহনার মুখ তার মনে আসার কথা নয়। কারণ সে মনেপ্রাণে তাকে ভুলতে চাইছিল। তবু এলো। ভারি অদ্ভূত। আজকের দিনটাই বোধহয় অদ্ভূত।

—তুমি কী ভাবুক প্রকৃতির? কথায় কথায় অন্যমনস্ক হয়ে পড়। মেয়েটি কে?

—কোন্ মেয়ে?

—যার জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লে?

একটা সিগারেট ঠোঁটে চেপে সুমন বলল, যদিও ব্যক্তিগত, তবুও বলছি, কোন মেয়েটেয়ে নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসর আমার নেই।

—ভেরী গুড। তাহলে ঠিক দুদিন পর তোমার জবাব আমি পাচ্ছি। মাইণ্ড ইট, মাত্র দুদিন। নইলে আমায় আবার অন্য কারো কথা ভাবতে হবে। চলো খেয়ে নিই। খিদে পেয়ে গেছে।

॥ দুই ॥

মাত্র পঞ্চাশ বছরেই অবনীমোহন বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। যতটা না দেহে তার থেকেও বেশী মনে। তিরিশ বছর আগে ঝোড়ো স্বপ্নের দিনগুলো একফুঁয়ে নিভে গিয়েছিল। আজ মনে হয় বড় অবিবেচকের মতো কাজ করা হয়ে গিয়েছে। আর পাঁচটা মানুষের মতো সাধারণ স্বপ্ন দেখলে আজ হয়তো একজিকিউটিভ র‍্যাঙ্কে কোন বিরাট অফিসের হর্তাকর্তা হয়ে বসতে পারতেন। স্ত্রীপুত্রে নির্ভেজাল সুখী মানুষ।

তিরিশ বছর আগে একটা ঝড় উঠেছিল। শোষন আর শাসনের বিরুদ্ধে জনতার রোষ আছড়ে পড়েছিল সারা দেশের বুকে। শুরুটা হয়েছিল তরাই আর নকশালবাড়ির মাটিতে। বিপ্লবী কণ্ঠে আওয়াজ উঠেছিল 'কামান দাগো সদর দপ্তরে', 'বন্দুকের নলই শক্তির উৎস' 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান'। সকালে ঘুম ভেঙ্গে মানুষ দেখতো দেওয়াল জুড়ে লেখা আছে, 'নকশাল বাড়ির পথ আমাদের পথ'।

অবনীমোহন তখন থার্ড ইয়ারের ছাত্র। চিরদিনই লেখাপড়ায় ছিলেন জুয়েল। বাবা রামমোহন ছিলেন সদাগরী অফিসের বিগ অফিসার। ত্রিশ বছর আগেই তাঁর লিখিত পড়িত মাইনে ছিল আট হাজারের কাছে। কলকাতায় নিজস্ব বাড়ি। কোম্পানী প্রদত্ত সর্বক্ষণ ব্যবহারের জন্যে গাড়ি। সুখী স্বচ্ছল পরিবারে বাবা মা দিদি আর দুভাই। অবনী ভাইদের মধ্যে কনিষ্ঠ। দাদা দীপ্তমোহন ভাই বোনের মধ্যে সব থেকে বড়। দীপ্তমোহন তখন সবে আই পি এসের ইন্সপেকটার পদে জয়েন করেছে। অবনীমোহন বাড়ির ছোট ছেলে। আদর যত্নের কোন ফাঁকই ছিল না। রামমোহনের ইচ্ছে ছিল লেখা পড়ায় ভালো অবনীকে ডাক্তারী পড়াবেন।

কিন্তু কোথা দিয়ে সব কিছু তাল গোল পাকিয়ে গেল। দেশ উদ্ধার বা রাজনীতির কোন গোলমেলে ব্যাপারে অবনীমোহনের কোন ইন্টারেস্ট ছিল না। তবু তিনি জড়িয়ে গেলেন।

মনে পড়ে সেই এক বিকেলের কথা। রমিতা ছিল ওঁর ক্লাস মেট। তারও বি এস সি থার্ড ইয়ার। আলাপ এবং বন্ধুত্বের

সীমা ছাড়িয়ে রমিতা কখন যেন তার খুব কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিল। রমিতা কাছাকাছি থাকলেই একটা অদ্ভূত মিষ্টি অনুভূতি তাঁকে পেয়ে বসতো। প্রায় দিনই কলেজ শেষ হলে দুজনে বেরিয়ে পড়তেন। কোনদিন গঙ্গার ধার। কোন দিন কফি হাউস। কোনদিন বা অকারণে কলকাতায় এলোমেলো ভাবে ঘুরে বেড়ানো।

বাবা মায়ের একমাত্র মেয়ে রমিতা গুপ্ত। বড়লোকের আদুরি মেয়ে বললেও ভুল হত না।

সেই রমিতাই হঠাৎ কেমন যেন পাল্টে যেতে শুরু করেছিল। অবশ্য তার আগেই কলকাতার ছাত্র যুবসমাজের মধ্যে ধীরে ধীরে একটা বদল শুরু হয়ে গিয়েছিল। দিন বদলের চোরাস্রোতটা তখনও অবনীকে স্পর্শ করেনি। কারণ তিনি থাকতেন তাঁর লেখা পড়া, বাবা মা দিদি দাদার আদর আর সদ্য প্রেমের রঙীন স্বপ্নে বিভোর হয়ে।

কিন্তু একদিন হঠাৎই তাঁর মনে হয়েছিল রমিতার চালচলন কথাবার্তায় অন্য এক সুর। আগে রমিতা ছিল উচ্ছল ঝরণার মতো। গাদা গাদা টাকা পয়সা নিয়ে, বন্ধুবান্ধব সিনেমা কফি হাউস আর অবনীর সঙ্গে হাল্কা রোমান্স করে দিন কাটিয়ে দিত। সেই মেয়েই, অবনীর মনে হয়েছিল, কোথায় যেন কিছুতে তার ছন্দপতন ঘটেছে। হারিয়ে গেছে সেই উচ্ছলতা। হাল্কা কথাবার্তা। দেখে মনে হত কী এক গভীর ভাবনায় সে ডুবে আছে। অবনীর ভালো লাগেনি। মনে মনে যখন তিনি ভাবছিলেন রমিতাকে এই নিয়ে কিছু খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করবেন ঠিক তখনই রমিতাই একদিন কলেজের সিঁড়ির মুখে পথ আটকেছিল।

ঝোড়ো কাকের মতো রমিতাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সামান্য বিচলিতও হয়েছিলেন। নিজেই এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমার কী অসুখ বিসুখ করেছে রমি। কদিন কলেজে আসছ না। তার ওপর এইরকম একটা বিধ্বস্ত চেহারা। এনিথিং রং?

ম্লান হেসে রমিতা কাছে এসে বলেছিল, তোমার এখন কোন কাজ আছে অবনী?

—হ্যাঁ, একটাই কাজ ছিল। আজ তোমার বাড়িতে যাওয়া।

—ঠিক আছে চলো। আমার বাড়িতেই।

—দেখাই যখন হয়ে গেল তখন আর বাড়ি যাবার কী দরকার ?

—এ কথা বলছ কেন ?

—তোমার বাড়ির লোক কিছু ভাবতে পারেন, তাই ?

মুখে ম্লান হাসি টেনে রমিতা বলেছিল, তোমার চেনা জগতের পরিধিটা বড় ছোট করে রেখেছ অবনী। চারদিকে তাকিয়ে কিছু দেখতে পাচ্ছ না ? নিঃশ্বাসে বারুদের গন্ধ আসছে না ?

অবাক হয়ে রমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে অবনী বলেছিলেন, বারুদের গন্ধ ?

- -হ্যাঁ। একটা কিছু জ্বলে ওঠার আভাষ ?

—তুমি কি জ্বলাজ্বলির কথা বলছ আমার মাথায় ঢুকছে না। তবে কলেজের দেওয়ালে বা রাস্তায়, বাজারে কিছু নতুন ধরনের পোস্টার চোখে পড়েছে।

—হ্যাঁ আমি ওগুলোর কথাই বলছি।

—ওরা কারা ? কী চায় ?

—জান না ? নাকি কোনদিন বোঝার চেষ্টাও করনি ?

—না করিনি। জানার বা বোঝার। কারণ রাজনীতি আমার মাথায় খেলে না।

কথা বলতে বলতে ওরা বাসস্ট্যাণ্ডে চলে এসেছিল। বাস আসতে দেরী হচ্ছিল। ট্রামের কোন পাত্তাই ছিল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর রমিতা বলেছিল, তুমি তো যাবে হেদুয়ার কাছে। আমার সেই বাগবাজার। চল হন্টন লাগাই।

সেকী, অবনী সামান্য বিস্মিত গলায় জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি তো বাড়ির গাড়ি কিংবা ট্যাক্সিতেই যাতায়াত কর। গাড়ি আনোনি বুঝতেই পারছি। তবে ট্যাক্সি এখন পাওয়া যাচ্ছে। নিয়ে নিলেই তো হয়।

—না, ঠিক করেছি ওগুলোয় আর উঠব না।

—বীতরাগ ?

—না বিরাগ।

—হঠাৎ ?

—না, এমনি। অযথা কিছু বাজে খরচ করে কী লাভ ?

—ভূতের মুখে রামনামের মতো শোনাচ্ছে। বেশ চল, তোমার

যখন হাঁটার ইচ্ছে হয়েছে।

হাঁটতে হাঁটতে সেদিন রমিতা অনেক কিছু বলেছিল। সংসদীয় পথের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হলে চলা শুরু করতে হবে সশস্ত্র কৃষক আন্দোলনের মতাদর্শে। যে আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে তরাই অঞ্চলে। শিলিগুড়ি থেকে আরো এগিয়ে নকশালবাড়িতে। শুরু হয়েছে জমি দখলের লড়াই। কৃষকরা হাতে অস্ত্র নিয়ে নেমে পড়েছে জোতদার খতম অভিযানে। রমিতা আরো বলেছিল, সেই আন্দোলনকে মদত দিতে হলে এখনই নেমে পড়তে হবে ছাত্র আর যুব সমাজকে। ক্ষেত থেকে যে আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়েছে তাকে নিয়ে আসতে হবে শহরে, গ্রামে, গঞ্জে। শোষণ আর শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র যুবকদেরই এগিয়ে যেতে হবে হাতে বন্দুক নিয়ে। একটা বিরাট পটপরিবর্তনের প্রয়োজন। ব্যালট নয় বুলেটই পারে সব লণ্ডভণ্ড করে নতুন সমাজ গড়তে।

রমিতার সব কথা সেদিন অবনীর মাথায় ঢোকেনি। হাঁ করে কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, তুমি এ সব কথা জানলে কোথা থেকে ?

উত্তরে রনিতা বলেছিল, তুমি কেন এখনও এসব জানো না সেটাই আমার কাছে বিস্ময়।

—কিন্তু এসব জেনে আমার কী লাভ বল ?

—শুধু নিজেরটা নিয়েই থাকবে ? আশেপাশের মানুষগুলো কী ভাবে বেঁচে আছে সেগুলো জানারও প্রয়োজন বোধ কর না ? এই পৃথিবীতে একা বাঁচা যায় ?

—কিন্তু আমি তো একা নই ?

—হ্যাঁ, তুমি, তোমার বাবা মা দিদি দাদা, না চাইতে সব কিছু হাতের কাছে চলে আসছে, তাই বোধহয় অন্য কিছু ভাবার নেই তোমার। তার ওপর আবার একজন প্রেয়সী আছে। মিডল্ ক্লাস সব সুখই তো হাতের মুঠোয়। কিছু মনে কোর না অবনী, আজ বোধহয় জীবনকে নতুন করে জানার আর ভাবার দিন এসেছে।

তিরিশ বছর ! দেখতে দেখতে তিরিশটা বছর কোথা দিয়ে কেটে গেল অবনীমোহনের। আজ ভাবলে মনে হয় রমিতা কী সেদিন ভুল স্বপ্ন দেখেছিল ? তাঁকেও তো সেই স্বপ্নে বিশ্বাসী

করে তুলেছিল। নাকি ভালবাসায় অন্ধ হয়ে রমিতার জন্যেই স্বপ্ন দেখার নেশায় মেতেছিলেন?

কলেজ স্ট্রীট থেকে সেদিন হাঁটতে হাঁটতে শ্যামবাজার পর্যন্ত রমিতার সঙ্গে গিয়েছিলেন নতুন ধরণের কথার ঘোরে। কিছুদিনের মধ্যেই অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে উঠেছিল রমিতার স্বপ্ন। নকশাল বাড়িতে কৃষক আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল শহর কলকাতায়। 'একটি স্ফুলিঙ্গই দাবানল সৃষ্টি করে' এমন এক স্লোগানই কাঁপিয়ে দিয়েছিল ছাত্র সমাজকে। নেমে পড়েছিল তারা মাঠে, ময়দানে, শহরের অলিগলিতে। অবনীমোহনও সেই জোয়ারের বাইরে থাকতে পারেন নি। রমিতার হাত ধরে পৌঁছে গিয়েছিলেন অ্যাকশান স্কোয়াডে। আসলে বিশ বছরের তরুণ হৃদয়ে সেদিন প্রজ্বলিত হয়েছিল রোষানল। যার বেশীটাই ছিল আবেগ। এখনও মাঝে মাঝে নিজের রুগ্ন হাতের দিকে তাকিয়ে অবনীমোহন ভাবেন এই হাতে একদিন অস্ত্র উঠে এসেছিল। কিছু নিরীহ মানুষকে খুন করতে হয়েছে দামাল উত্তেজনায়। পোড়াতে হয়েছে ট্রাম বাস। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা যে ছাত্রসমাজকে ভুলপথে নিয়ে যাচ্ছে তার প্রতিবাদ হিসেবে বিদ্যাসাগরের পাথুরে ঘাড়েও শাবল ঠুকতে হয়েছে।

আসলে রাজনীতির প্যাঁচপয়জার না জানা থাকা সিধেসাদা শিক্ষিত মাথাগুলোকেই সেদিন বেছে নেওয়া হয়েছিল। উর্বরা জমিতে বীজমন্ত্র নিমেষে কাজ শুরু করেছিল। নইলে একটা ঘোর লাগা বিশ্বাসের নেশায় মানুষের গলায় চপারের কোপ লাগাতে তাঁদের দ্বিধা হয়নি কেন সেদিন?

অন্যদিকে দাবানলের মত ছড়িয়ে যাওয়া খতম অভিযানকে খতম করার অভিযানও শুরু হয়ে গিয়েছিল। আর ঠিক তখনই অবনীমোহনকে মুখোমুখি হতে হল বাবা মা আর দাদার সামনে। রক্তাক্ত শহরে তখন তিন শ্রেণীর মানুষ বিচরণ করছে। একদল তরুণ তাজা বুদ্ধিদীপ্ত ছেলে, হাতে তুলে নিয়েছে বোমা, পাইপগান আর চপার, আর একদলের হাতে কার্তুজ ঠাসা স্টেইনগান, আর একদল হতবাক, ভীত সন্ত্রস্ত সাধাবণ চাকুরে আর ব্যবসায়ী। একদা প্রাণচঞ্চল শহর তখন বারুদের গন্ধে ঝিম্ মেরে গেছে!

সন্ধ্যার মুখে পিছনের পাঁচিল টপ্‌কে বাড়ি ফিরতেই একদম

ঘেরাও। বৈঠকখানায় তখন বাবা, দাদা, দিদি আর মা। রামমোহন বরাবরই গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। গলার আওয়াজটাও ছিল তেমনি গমগমে। হিমেল কণ্ঠে একটাই প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি নকশাল ?

কোন উত্তর দেবার ছিল না। নীরবে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

—তোমার নামে অ্যারেস্ট ওয়ারেণ্ট তৈরী হয়ে গেছে। তুমি হয়তো জাননা, ঠিক তোমার পিছনেই অন্তত একটা সোর্স সর্বদাই ঘুরে বেড়ায়। কেবল তোমার দাদার জন্যেই আজও তুমি বাড়ি ফিরতে পেরেছ। কিন্তু সেটা বোধহয় আর দু একদিনের বেশী ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। কিছু বলার আছে ?

— আপনিই বলুন।

—তুমি এই পথে কেন গেছ, কী জন্যে গেছ এসব প্রশ্ন আজ অবান্তর। এই বেপরোয়া রাজনীতিতে তুমি কতটা বিশ্বাসী তাও আমি জানতে চাইনা। কিন্তু আমার একটা সংসার আছে। তোমার দাদাকে পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে চাকরি করতে হয়। তোমার জন্যে আমি দুটো অলটারনেটিভ ব্যবস্থা ভেবেছি। কোনটা বাছবে সেটা তোমার ওপর নির্ভর করছে।

কোন উত্তর না দিয়ে একবার বাবা আর মার মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে নীরবে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

—তোমাকে ইমিডিয়েট এ শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে। উঠবে বম্বে। তোমার মাসীর বাড়ি। ওখানে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাশে ভর্তি হয়ে যাবে। এদিকে জার্মানীর একটা ফার্মের সঙ্গে আমি নিগোশিয়েসান চালাচ্ছি। মনে হয়ে চাকরিটা হয়ে যাবে। ওখানেই থাকবে। মিনিমাম দশ বছর। সেই রকমই কনট্র্যাক্ট হবে। এর মধ্যে একদিনের জন্যেও দেশে ফেরা চলবে না।

— আর দ্বিতীয় পথ ? খুব শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন অবনীমোহন।

—এ বাড়ি ছেড়ে চিরদিনের মতো চলে যেতে হবে। পুলিশের গুলিতে মারা পড়লে, তোমার মা দিদি কাঁদবে, দাদা কষ্ট পাবে। এবং আমিও। আর মারা না পড়ে যদি ধরা পড় তাহলে কিন্তু কোনভাবেই এ বাড়ির কোন সাহায্য আশা করবে না। ভেবে দেখ,

শুধু আজকের রাতটাই সময় পাচ্ছ।

বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সেই রাতেই ফোন করেছিলেন রমিতাকে। খুলে বলেছিলেন সব কথা। ঘুম জড়ানো আড়ষ্টতা কাটিয়ে রমিতা কাটা কাটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিল, ঐ একই প্রশ্ন, আমারও, তোমার কাছে।

-- তার মানে ?

—তোমার বাবা ঠিক কথাই বলেছেন।

—বাবার কথা থাক। প্রশ্নটা আমি তোমাকেই করেছি।

—আমি কিন্তু মনস্থির করে নিয়েছি।

—কী ব্যাপারে ?

—সব বাবা মা যা বলেন আমার বাবাও সেই কথাই বলেছেন। তোমার মতো অতবড় ব্যাপার না হলেও তিনি আমায় সোজা দিল্লী পাঠাতে চান ওনার এক বন্ধুর ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে। কিন্তু মজাটা কী জান, বাবারা জানেন না তরাইয়ে যে আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল আজ তা ছড়িয়ে গেছে নকশালবাড়ি ছাড়িয়ে সারা পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, অন্ধ্র আর উত্তরপ্রদেশে। দিল্লীও কী খুব সেফ ? যে মেয়ের বুকের মধ্যে সমাজ বদলের স্বপ্ন, প্রতিমুহূর্তের নিশবাসে যে বারুদের গন্ধ পায়, তাকে দিল্লী পাঠিয়ে কী বাবার ভাবনার ঘরে সুখী পায়রার বকবকম আওয়াজ উঠবে ?

—রমিতা, অধৈর্য্য হয়ে অবনী বলেছিলেন, আর বক্তৃতা ভালো লাগছে না। তুমি কী করতে বল সেটাই শুনতে চাইছি।

—এটাও সেই পাতি বুর্জোয়া মার্কা কথা হয়ে গেল। যে পথে আমরা পা বাড়িয়েছি সেখানে সস্তা দৈহিক প্রেমের কোন আবেগ নেই। ওসব ভাবনাগুলো আমার মন থেকে কখন যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আমার সামনে এখন ঘর বলে কিছু নেই। একান্তই যদি যৌনতাড়িত হই, কারণ ওটা বাদ দিয়ে জীবন আছে এমন কথা কোন বিপ্লবীও বলবে না। সেদিন যাকে আমার ভালো লাগবে তাকে নিয়ে প্রবৃত্তি মিটিয়ে নোব। কিন্তু সেটা কোন বন্ধন নয়। কোন এগ্রিমেন্ট নয়। নট ইভন্ লীভ টোগেদার। ব্যাপারটা খাওয়াদাওয়ার মতোই।

—বোধহয় এইখানেই তোমার সঙ্গে আমার তফাৎ রমিতা। তোমার উগ্র বিপ্লবী চেতনা, আমার আজ মনে হচ্ছে, আবেগ আর হঠকারিতার নীট্ ফল। জীবনকে আমি এতো হেলাফেলায় নিতে পারছি না। বিপ্লব মানে জীবনকে বিমুখ করা নয়। বিপ্লব মানে একটা আদর্শের জন্যে সাচ্চা সৈনিক হয়ে লড়ে যাওয়া। আর যৌনতাড়না মেটানো বলতে যা বললে ওটা এক ধরনের ডিবচারি এবং অসুস্থতা। আমি বিশ্বাস করি না ওই অসুস্থ জীবনকে।

—আমি বিশ্বাস করতে বলিনি। আর এ কথাটা তুমি বলছ একটা পুরনো সংস্কার থেকে। যে বোধটা জন্ম থেকেই তোমার মধ্যে তৈরী করে দেওয়া হয়েছে। আমি সৎ আমার বউ সতী। আমার ছেলে মেয়েরা একটা সুখী দম্পতির সফল প্রোডাকশান।

—এত রাতে আমি তোমার সঙ্গে আর তর্ক করতে চাই না রমিতা। আমার আজ মনে হচ্ছে একটা মোহ সেই সময় কাজ করেছিল। আবেগ আমাকে দিয়ে অনেক নৃশংস কাজ করিয়ে নিয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই নিরীহ কনস্টেবল অথবা আই বি ডিপার্টমেন্টের ছাপোষা সোর্সদের মুণ্ডচ্ছেদন করতে গিয়ে হাত কেঁপে উঠেছিল। সেই উন্মাদ মুহূর্তে অন্য ভাবনা কাজ করেনি। যা কিছু করেছি সব তোমাদের নির্দেশেই।

—এখন কী অনুতপ্ত ?

—যদিও আমি দূর ভবিষ্যত দেখতে পাইনা! সে অলৌকিক ক্ষমতা আমার নেই, তবু কেমন যেন আজ আন্দোলনের তুঙ্গ মুহূর্তে এসে মনে হচ্ছে এই এলোমেলো খুনখারাবি কখনোই বিপ্লবের লক্ষ্যে পেঁছতে পারবে না। কয়েকটা আমারই মতো, হুইমজিক্যাল নাবালকের হাতে অস্ত্র তুলে দিলেই সমাজব্যবস্থা পাল্টাতে পারে না। আমার পরিণতি কী হবে তা জানিনা, জানার জায়গাতেও নেই। তবে যতই গভীরে যাবার চেষ্টা করছি ততই মনে হচ্ছে একটা মহাজন, চারটে কনস্টেবল কিংবা একজন সাধারণ ব্যবসায়ীকে খুন করে সামাজিক ইতিহাস পাল্টানো যায় না। আর, সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বাদ যারা পেয়েছে, তাদের পোষা বুলডগগুলো বসে নেই। সেই সব সুখী সাংসদরা ব্যালটের জন্যে কত রাউণ্ড বুলেট প্রয়োজন তা তারা ভালোই

জানে।

—এক কাজ করো অবনী। তোমার বাবার দেওয়া প্রথম প্রোপজালটাই অ্যাকসেপ্ট করে নাও। কাঁটার রাস্তায় চলার অভ্যেস তোমার নেই। আমি লোক চিনতে ভুল করেছিলাম। আসলে তোমার আমার বয়েসটা তো প্রায় একই। আশা করব আর যেন আমাদের দেখা না হয়।

বলেই কটাং শব্দে ফোন নামিয়ে রেখে দিয়েছিল রমিতা। না, রমিতার সঙ্গে আর দেখা হয়নি অবনীর। উড়ো খবর, তবু যেটুকু শোনা গিয়েছিল, রমিতা নাকি পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল। চরম নিপীড়নে কেউ বলে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল, কেউ বলে তার নিম্নাঙ্গের সব শক্তি হারিয়ে কোন এক দাদার আশ্রয়ে শয্যাধীন থেকে একসময় মারা গেছে।

কিন্তু অবনীমোহন! অবনী নিজেকেই জিজ্ঞাসা করেন, তুমি সেরাত্রে কী করেছিলে?

বিপ্লবে স্থির বিশ্বাসী না হয়েও শিভ্যালরি দেখাতে রাস্তাটাকেই বেছে নিয়েছিলে। তখনও ভালো করে ভোর হয়নি। আর কিছু পরেই বাবার কাছে গিয়ে জানাতে হবে তার ভবিষ্যত সে কোনদিকে নিয়ে যেতে চায়।

খানিকক্ষণ অন্ধকার ছাদে পায়চারী করতে করতে শুনছিলেন এদিকে সেদিকে দুমদাম শব্দে বোমার আওয়াজ। অতন্দ্র সৈনিকের দল তাদের কাজ করে চলেছে। অনেক টান আর দোটানার পর সোজা নিচে নেমে এসেছিলেন। সঙ্গে সামান্য টাকাকড়ি কিছু। প্রায় এক বস্ত্রে রামমোহনের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। কোথায় যাবেন, কী করবেন, কিছুই তার জানা ছিল না। একমাত্র রমিতা ছাড়া পার্টির আর কারো সঙ্গেই তেমন কোন ঘনিষ্ঠতাও ছিল না। মেইনলি নির্দেশ আসত গোপনে রমিতার কাছ থেকেই। রমিতা কোনদিনও অ্যাকশানে ছিল না। তাঁকে বলা হত অমুক জায়গায় অমুকের সঙ্গে মীট্ করবে। অপারেশান সাকসেস করে যে যার মতো ছড়িয়ে যাবে। আর ধরা পড়লে ভুলেও কখনও গোপন সংগঠনের নামোল্লেখ করবে না।

এটাও ভুল। অবনীমোহন মনে করেন। বিপ্লবীরা যদি

নিজেদেরই ভালো করে না চেনে, পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকে, সুষ্ঠভাবে কাজটা হবে কেমন করে ? এ যেন একটা মেশিন কাজ করে চলেছে। অথচ একটা নাট্ আর একটাকে চেনে না।

আপাদমস্তক একটা কালো চাদরে নিজেকে মুড়ে নিয়ে প্রায় ভিখিরির মতো এলোমেলো পদক্ষেপে, নির্জন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তন্ন তন্ন সজাগ দৃষ্টি ছড়ানো ছিল চারদিকে। শহরের প্রতিটি নির্জন রাতের রাস্তার বাঁকে বাঁকে তখন ওৎপাতা মৃত্যু। একবার নিজের কোমরের কাছে আটকানো রিভলবারটা ছুঁয়ে দেখে নিয়েছিলেন। মরলে একজন কি দুজনকে নিয়েই মরবেন।

উদ্দেশ্য ছিল নিমতলা শ্মশানের মধ্যে কোন রকমে সেঁদিয়ে যাওয়া। তারপর শবযাত্রীদের সঙ্গে রাতটা কাটিয়ে ভোরেই গঙ্গা পার হয়ে হাওড়ার দিকে চলে যাওয়া। কিন্তু অতদূর এগুনো যায়নি। গলি তস্য গলি দিয়ে সেন্ট্রাল অ্যাভেন্যুর কাছাকাছি চলে এসেছিলেন। আর এক একটু গেলেই সেন্ট্রাল অ্যাভেন্যু। তারপরই নিষিদ্ধ পল্লী। তেমন কিছু হলে কোন একটা বাড়িতে ঢুকে পড়লেই হবে।

সে সময় পাওয়া যায়নি। হঠাৎই অন্ধকার ফুঁড়ে গোটা চারেক রোগা পটকা ছেলে তাঁকে ঘিরে ফেলেছিল। কিছু বোঝার আগেই একটা ছেলের পাইপগানের নল তাঁর বুকে সাঁটা হয়ে গিয়েছিল।

অবনীমোহন জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিলেন, কী চায় তারা।

ওদেরই একজন বলেছিল, সঙ্গে যে রিভলবারটা আছে আগে সেটা চাই।

—আমার কাছে রিভলবার আছে কে বলল তোমাদের ?

আর একজন প্রায় ঝাঁঝালো নিম্ন স্বরে বলেছিল, বেশী আগড়ম বাগড়ম বকার এখন সময় নেই। দেবে না গর্দান উড়িয়ে কেড়ে নিতে হবে ?

— দোব। তবে একটা কথার উত্তর দেবে ?

—আমরা কারো কথার উত্তর দিই না।

—জানি। কিন্তু তোমার নাম না জানলেও মুখটা আমার

চেনা বলেই বলছি। তোমাদের রমিতা পাঠিয়েছে, তাই না?

—জানার দরকার নেই।

—আমি জানি।

—তাহলে নিশ্চয় এটা জানো পার্টির সঙ্গে বিদ্রোহ করলে তার শাস্তি কী হয়?

—জানি, বলেই গায়ের চাদরটা খুলে নিমেষের মধ্যে পাইপগান তাক করা ছেলেটাকে প্রায় ঢাকা দিয়ে দেন। আর যে ছেলেটি এতক্ষণ বড় বড় কথা বলছিল, কিছু বোঝার আগেই তাকে ক্লোজ রেঞ্জ থেকে ট্রিগার টিপে সোজা সেন্ট্রাল অ্যাভেন্যুর দিকে ছুটে পালাতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু পালানো যায়নি। সামনেই তখন সশস্ত্র সি আর পির ঝাঁক। নিমেষের মধ্যে পিছন ফিরে তাকাবার অবসরে দেখে নিয়েছিলেন একজন মাটিতে স্থির হয়ে পড়ে আছে আর বাকী তিনজন ছুটছে। তারাও বেশীদূর যেতে পারেনি। সি আর পির স্টেইনগানের ঝাঁক গুলি তাদের শুইয়ে দিয়েছিল। আর অবনীমোহন! একজন ষণ্ডা যমদূতের মতো পালোয়ান পুলিশ খামচে ধরেছিল তাঁর চুলের মুঠি।

লোডশেডিং হওয়া অন্ধকার ঘরের জানলার ধারে বসে থাকতে থাকতে একবার নিজের মাথায় হাত রাখেন। সেই কুচকুচে কালো ঝাঁকরা চুলের মাথা এখন প্রায় বিকচ। পুলিশের বোধহয় চুলের গোছার দিকে নজর থাকে বেশি। মুঠো মুঠো চুল গোড়াসমেত উপড়ে নিয়েছিল। সে ছিল ভয়ংকর আর বীভৎসতার দিন। মানুষ যে মানুষের ওপর এমন নির্মম আর নির্দয় হতে পারে তা তাঁর চেতনায় ছিল না। তিনি নিজেও কিছু মানুষকে খুন করেছিলেন। কিন্তু এক আঘাতেই তারা শেষ হয়ে গিয়েছিল! তিল তিল যন্ত্রণার আঘাতে পঙ্গু করে দেওয়া মার যা এখনও ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। পেট থেকে কথা বার করার জন্যে, নকশালদের ডেরাগুলো জানার জন্যে, দলের মাথাগুলোর ঠিকানা পাবার জন্যে শান্তি রক্ষকের দল নিত্য নতুন মারের কৌশল আবিষ্কার করতো। দুশো বছরের পরাধীনতার শেষ শিক্ষা বোধহয় ওটাই ছিল। শোষণের দমদেওয়া কুত্তা, শান্তিরক্ষার নামে বর্বর গুন্ডামি।

অবনীমোহন ভাবতেই পারেননি আর কোনদিনও জেলের

বাইরে খোলা আকাশের নীচে গিয়ে দাঁড়াতে পারবেন। কিন্তু সেটাও ঘটেছিল। সাতাত্তর সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরই প্রতিশ্রুতি মতো বিনাশর্তে বন্দীদের মুক্তি দেওয়া এবং তাদের বিরুদ্ধে সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল।

খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে সেদিন মুক্তির স্বাদ হয়তো পেয়েছিলেন কিন্তু ততদিনে তাঁর সব শান্তি শেষ হয়ে গেছে। রুগ্ন প্রায় অথর্ব অবস্থা। দুটো ষণ্ডা পুলিশ নিয়ম করে পাছার কাপড় সরিয়ে শিক্ষিত পটুত্ব দিয়ে ঠিক একই জায়গায় রুলের প্রহার করতো। কখনও বা গুহ্যদেশে ঢুকিয়ে দিত রুলের অগ্রভাগ। একটা সময় এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যখন তাঁর পক্ষে বসার উপায় ছিল না। হাতের আর হাঁটুর জোর প্রায় নেই বললেই চলে। মেরুদণ্ড বেয়ে এক অদ্ভূত শিরশিরানি এখনও মালুম পাইয়ে দেয় সেই অন্ধকারের দিনগুলোর কথা।

মুক্তির পরের দিনগুলো আরো ভয়াবহ। দৈহিক যন্ত্রণার থেকেও বেশী কষ্টকর মানসিক যন্ত্রণা। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলেন বিপ্লবের সেই আকুতি আর কোথাও নেই। বাতাসে বারুদের গন্ধ উধাও। কলকাতা চলছে কলকাতার মতোই। কিন্তু তাঁর চারপাশে কেউ নেই। প্রথমেই মনে পড়েছিল রমিতার কথা। আচ্ছা রমিতা কি সেদিন তাকে শেষ করে দিতে চেয়েছিল? রমিতা? সেই রমিতা যে একদিন ভালোবাসার কথা শুনিয়েছিল। আজও মাঝে মাঝে অবনীমোহন ভাবেন বিপ্লবীরা কী স্নেহ, মায়া মমতা আর ভালবাসার উর্দ্ধে? কিন্তু ভালোবাসা ছাড়া কোন বিপ্লবই তো সুস্থ হতে পারে না। নাকি রমিতা তাঁকেও বিশ্বাস করতে পারেনি। প্রবল পুলিশি নির্যাতনের মধ্যেও তিনি কিন্তু একবারের জন্যেও রমিতা বা দলের আর কারো নাম উচ্চারণ করেন নি। অত্যাচারের তীব্রতায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন কিন্তু রমিতার নামটাও কখনো মনে করার চেষ্টা করেননি।

সেই কারণেই অবনীমোহন চেয়েছিলেন অন্তত একবারের জন্যেও রমিতার মুখোমুখি হতে। নিজের অশক্ত শরীর নিয়েও ধুঁকতে ধুঁকতে গিয়েছিলেন রমিতার বাগবাজারের বাড়িতে। পাননি। সেখানে তখন অন্য মুখ। রমিতার বাবা বাড়ি বিক্রি

করে দিয়ে কোথায় যেন চলে গেছেন।

এরপর ফিরে এসেছিলেন নিজের বাড়িতে। সে আর এক নির্মম অভিজ্ঞতা। দরজায় কড়া নাড়তেই একটি সম্পূর্ণ নতুন মুখের চাকর এসে দরজা খুলে জানতে চেয়েছিল তাঁর পরিচয় এবং কাকে চাইছেন!

জেল থেকে ছাড়া পাবার পর বিশবছর কেটে গেছে। কিন্তু সেদিনের কথা আজও স্মৃতির পাতায় জ্বলজ্বল করছে। ভৃত্য-টিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, রামমোহনবাবু আছেন? লোকটা একটু অবাক চোখে তাকিয়ে বলেছিল, আজ্ঞে না, তিনি বছর দুই মারা গেছেন।

ধক্ করে বুকের ওপর একটা শব্দ উঠেছিল, বাবা কী তাঁর কারণেই চলে গেলেন, পাছে একদিন ছোটছেলের মুখোমুখি হতে হয়। অথবা ছোটছেলেকে বেশী ভালবাসতেন বলে আঘাত সহ্য করতে পারেন নি।

—তোমার মা আছেন? মানে রামমোহনবাবু স্ত্রী?

—হ্যাঁ আছেন।

—তাহলে বল, অবনী এসেছে।

বিনা বাক্যব্যয়ে লোকটা চলে গেছিল। মাত্র দু তিন মিনিটের মধ্যে যিনি এসে দাঁড়িয়েছিলেন, এক লহমার জন্যে তাঁকে চিনতে অসুবিধে হয়েছিল। কোথায় মায়ের সেই লক্ষ্মীঠাকরুণের মতো মুখ আর মিষ্টি গড়ন। শীর্ণকায়, ভাঙ্গাগাল, হনু দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসা এই বিধবা মহিলা তাঁর মা! ভাবতেও পারছিলেন না। মায়ের মুখ ঠেলে বেরিয়ে আসা প্রথম কথাটা আজও মনে পড়ে, তাহলে তুই এলি?

—হ্যাঁ মা, আর তো আমার যাবার কোন জায়গা নেই।

কান্না চাপা মুখটাকে আড়াল করে একটা হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন একেবারে নিজের ঘরে। তারপর কত কথা, কত দুঃখ আর কান্নার ইতিহাস।

দিদির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। খবর পেয়ে সেও ছুটে এসে-ছিল। সংসারে মা আর দিদিদের যা ধর্ম তারা সেটাই করার চেষ্টা করেছিলেন। অবনীমোহনও ঠিক করে নিয়েছিলেন, অথর্ব শরীরটা একটু চাঙ্গা করে নতুন ভাবে জীবন শুরু করার কথা।

কিন্তু জীবনের আরো এক নতুন অভিজ্ঞতার কথা তখনও তাঁর জানা ছিল না। মানুষের ওপর মানুষের অত্যাচার, হৃদয়হীনতা ভালোবাসাকে খুন করা এসব জানা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আরো এক চরম নির্মমতার অভিজ্ঞতা হল দাদা দীপ্তমোহনের মুখোমুখি হতে গিয়ে।

পুরো দোতলাটাই ছিল দীপ্তমোহনের অধিকারে। অবনীমোহনের ফিরে আসার সংবাদ পেয়েও সে দেখা করতে আসেনি। দিন দুয়েক পরেই অবনীমোহন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, দাদাকে তো দেখছি না মা! বাইরে টাইরে কোথাও গেছে নাকি?

ম্লান হেসে মা বলেছিলেন, না খোকা, তারা এ বাড়িতেই আছে, তবে আলাদা আছে।

—আলাদা মানে?

—তোর বাবা বেঁচে থাকতেই দীপ্ত বিয়ে করে। তারপর উনি চলে যাবার পর একদিন এসে বলল, ওর বউয়ের সঙ্গে আমার ঠিকমতো বনিবনা হচ্ছে না তাই ওরা আলাদা থাকার মনস্থির করেছে।

—তুমি পারমিশান দিলে?

—হ্যাঁ খোকা। সেটাই ছিল মঙ্গলের। দিনরাত অশান্তির থেকে সেটাই ভালো।

—কেন বউদির সঙ্গে তোমার কী ঝগড়াঝাটি হতো?

—হ্যাঁ, হত। তুই তো জানিস খোকা, তোর বাবা কিছু সামাজিক ব্যাপার মেনে চলতেন। তাঁর স্ত্রী হয়ে আমিও সেইগুলো মানতাম। কিন্তু সেই মানা আর মানিয়ে নিতে না পারার কোঁদল এখানেও শুরু হয়ে গিয়েছিল। আসলে আমি প্রাচীন পন্থী আর তোর বউদি একেবারে একালের মেয়ে। দুজনেই সমান গোঁ ধরে থাকলে শান্তি তো থাকে না।

—আমি কী বউদির সঙ্গে দেখা করব?

—কেন?

—একই বাড়িতে থেকে, দুটো আলাদা সংসার?

—না খোকা। ওসব তুমি করতে যাবে না। আমি সেটা চাইও না।

—কিন্তু তোমার চলে কী করে?

—তোমার বাবা আমার জন্যে যা রেখে গেছেন তাতে আমার আজীবন মাথা গোঁজার ঠাঁই আর ভাত কাপড়ের অভাব হবে না। এখন তুই এসেছিস। একা থাকার ভয়টা চলে গেল।

—দাদা কিছু বলেনি ?

—দাদা তোর বউদিকে আমার থেকেও বেশী ভালবাসে। এটাই তো জগতের নিয়ম। একদিন তুইও তাই হবি।

কিন্তু দীপ্তমোহনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েই বাধল গণ্ডগোল। তিনি তখন পুলিশের জাঁদরেল অফিসার। মেজাজটাও সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছে ? সরাসরি দীপ্তমোহনের সামনে দাঁড়াতেই, একবার অবহেলার দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে দীপ্ত বলেছিল, কবে ছাড়া পেলি ?

— এ খবর তো আমার থেকেও তোমার আগে জানার কথা।

—হুঁ। তা এখন কোথায় উঠেছিস ?

—মার কাছে।

পাশের সোফায় বসে বউদি তখন উল বুনছিল। একবার তীর্যক দৃষ্টিতে অবনীমোহনকে দেখে নিয়ে স্বামীর উদ্দেশ্যে বলেছিল, কিন্তু ও তো এখানে থাকতে পারে না, তাই তো দীপ্ত ?

—কেন, থাকতে পারি না কেন ?

—বাবার সেই রকমই নির্দেশ ছিল। এবারের উত্তরটা আসে দীপ্তমোহনের কাছ থেকে।

—বাবার নির্দেশ ছিল, এ কথার অর্থ বুঝলাম না।

—মাকে জিজ্ঞাসা করে নিস।

—তুমিই বল।

—মারা যাবার আগে বাবা বলে গিয়েছিলেন, অবনী যেন এই বাড়ির চৌকাঠ কোনদিন না পেরোয়। এবং বাড়িটাও উনি আমার নামে করে গিয়েছিলেন। উইলের শর্ত ছিল একটাই, মা যতদিন বেঁচে থাকবেন কেউ তাঁকে এ বাড়ি থেকে বার করে দিতে পারবে না এবং বাবার নগদ যা কিছু টাকাকড়ি সেগুলো মা যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন অন্য কেউ তাতে ভাগ বসাতে পারবে না।

—অর্থাৎ তুমি বলতে চাইছ এ বাড়িতে আমার থাকার কোন

অধিকার নেই ?

—বাবার শেষ ইচ্ছে তাই ছিল।

—আর তোমার ইচ্ছেটা কী ?

—হ্যাঁ, আমিও চাই না খুনী এবং পুলিশ একই বাড়িতে থাকুক।

—কিন্তু দুজন খুনীর একই বাড়িতে থাকার তো কোন অসুবিধা নেই।

—হোয়াট ডু ইউ মীন, দীপ্তমোহনের সদীপ্ত হুঙ্কার।

—তোমরা হচ্ছ আইনের তবকে ঢাকা খুনী আর আমরা আইন নস্যাৎ করা খুনী।

—ফের যদি তুই অ্যারেস্টেড হতে না চাস তাহলে কালই এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবি।

- যে আইনে একবার অ্যারেস্ট করিয়েছিলে সেটা তো আর এখন খাটবে না।

—কোন আইনে কি খাটবে সেটা বোধহয়,

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অবনী বলেছিলেন, বোধহয় না, নিশ্চিত করে বলছি সেটা তুমি খুব ভালো করেই জানো।

অবনীমোহন বেরিয়ে এসেছিলেন। একবারের জন্যেও যাচাই করে দেখতে চাননি সত্যিই রামমোহন এরকম কোন উইল করে ছিলেন কিনা। এ নিয়ে মাকেও আর অশান্তির মধ্যে টানতে চাননি। কেবল মায়ের দেওয়া হাজার বিশেক টাকা সঙ্গে নিয়ে ছিলেন। আবেগের দিনগুলো যে ততদিনে অনেকটা পেরিয়ে এসেছেন।

নিজের বাড়ির সঙ্গে সব সংস্রব ছেড়ে এসে উঠেছিলেন বস্তি অঞ্চলের একতলা একটা ঘরে।

এরই মধ্যে একদিন দেখা হয়ে গেল শিউলির সঙ্গে। শিউলি। সত্তরের সেই ভয়াবহ পলায়নের দিনে একবার পুলিশের তাড়ায় এক গভীর রাতে এসে উঠেছিলেন পতিতা পল্লীর এক ঘরে। মধ্য রাতের ক্লান্তি শেষে মেয়েটি তখন হয়তো শুতে যেতে চেয়েছিল। অবনীমোহন তখন দরজা ধাক্কা দিচ্ছিলেন। ভেতর থেকে মেয়েটি বলেছিল, সে রাতে আর কোন বাবু সে নিতে পারবে না।

অবনী বলেছিলেন সে কোন বাবু নয়। কোন অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে দরজা ধাক্কা দিচ্ছে না। একরাতের একটু আশ্রয় না দিলে

এখ্খুনী হয়তো পুলিশের গুলিতে তাকে শেষ হয়ে যেতে হবে।

দরজা খুলেছিল মেয়েটি। কোন প্রশ্ন করতে না দিয়েই অবনী দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে চোখবুজে দাঁড়িয়ে ছিলেন। একটু পরেই ভারী পুলিশি বুটের আওয়াজ শোনা গিয়েছিল। তারও অনেক, অনেক পরে বুটের শব্দ মিলিয়ে গেলে ধীরে ধীরে অবনী গিয়ে বসেছিলেন মেয়েটির খাটে।

এতক্ষণ মেয়েটিও কোন কথা বলেনি। সে কেবল স্থির দৃষ্টিতে অবনীকে লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। সব নিঃস্তব্ধ হয়ে গেলে জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমার মতলবটা কী বলত বাবু? দেখে তো মনে হচ্ছে ভদ্রঘরের ছেলে। গলা টিপলে এখনও দুধ বেরুবে। তা এই নরকে কেন?

অবনী বলেছিলেন, তোমার কথার উত্তর দোব। তার আগে এক গ্লাস জল খাওয়াও। আর খাবারটাবার কিছু থাকলে সেটাও দাও। পেট জ্বলে যাচ্ছে।

কে জানে কী মনে হতে মেয়েটি ঘরে যা ছিল তাই সাজিয়ে এনে ধরেছিল তার সামনে। তারপর বলেছিল, বেশ্যার ঘরের খাবার মুখ দিয়ে নামবে তো?

ম্লান হেসে অবনী বলেছিলেন, আমি বেশ্যা টেশ্যা নিয়ে আলাদা কিছু আছে বলে মাথা ঘামাই না। পেটের দায় আমাদের সবার। তার জন্যে রোজগার করতে হয়। তোমার রোজগারটা ঐ পথে। তাবলে খাবারটার গায়ে তো লেখা নেই ওটা বেশ্যার হাতে তৈরী।

—বাবা, মুখে যেন কথার খৈ ফুটছে! তা বল তো বাপু রাত দুপুরে জ্বালাতে এলে কেন? পুলিশে তাড়া করেছিল বলে মনে হচ্ছে। কী কর, চুরি না দেশ উদ্ধার? এখন তো আবার তোমাদের বয়েসী ছেলেদের ঐ রোগে ধরেছে।

—এটাকে রোগ বলছ কেন?

—রোগ নয়? এ সব করে কী হবে? কটা মানুষ খুন করে, কী কটা ট্রাম বাস পুড়িয়ে দেশের সব মাথাঅলা ডাকাতগুলোকে শেষ করতে পারবে?

—চেষ্টা করতে দোষ কী?

—বাড়িতে বাবা মা কেউ নেই?

—সবাই আছে।

—তারা জানে।

—বলতে পারব না।

—জানো, একদিন ক্ষুদিরাম, সুভাষ বোসের দল ইংরেজ তাড়াবার জন্যে কেউ গুলি খেয়ে মরেছিল, কেউ ফাঁসীতে লটকেছিল। কেউ আবার চিরজীবনের জন্যে দেশান্তরী হয়েছিলেন। দেশ থেকে তো ইংরেজ চলে গেছে। কিন্তু কী হয়েছে বল তো? তখন সাদা চামড়ার মানুষগুলো অত্যাচার করতো আর এখন দিশী কালো চামড়ার মানুষেরা আরো বেশী করে অত্যাচার করছে। হাত বদল ছাড়া আর তো কিছুই হয়নি।

চমকে উঠেছিলেন অবনীমোহন। প্রায় অশিক্ষিত এক দেহ-পজীবিনীর মুখে এসব কি শুনছেন তিনি। তাহলে অশিক্ষিত গরীব মানুষেরাও বুঝতে পেরেছে, পালা বদল হয়েছে কিন্তু দিন বদলায়নি। এবার সরাসরি মুখের দিক তাকিয়ে ছিলেন। শ্যামবর্ণা, ভারী সুশ্রী মুখ, শরীর স্বাস্থ্যও বেশ ভাল। আর বয়েসটা হয়তো তারই মতো কী দু তিন বছরের বড়ো। জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার নাম কী?

—কোনটা বলব আসল না নকল?

—এ রকম হয় নাকি?

—হ্যাঁ, একটা বাবামায়ের দেওয়া আর একটা মাসীর দেওয়া।

—মাসীটি কে?

—আমাদের দন্ডমুন্ডের মালকিন। এখানে সব কিছুই ঐ মাসীদের নির্দেশই চলে।

আর ও প্রসঙ্গে না গিয়ে অবনী জিজ্ঞেস করেন, তোমার আসল নামটাই বল।

—শিউলি। তোমার নাম কী? আসলটা বলবে।

—অবনী। অবনীমোহন রায়।

—আজকের রাতটা না হয় বাঁচলে, কাল কী করবে?

—যদি পুলিশের হাতে না পড়ি তাহলে নতুন কাজের যা নির্দেশ আসবে তাই করব।

—বাড়ি ফিরবে না? তোমার বাবা মা তোমার জন্য অপেক্ষা করবে না? সোমত্ত ছেলে। ভয় করে না তাদের?

—জানি না। এখনও পর্যন্ত তেমন সন্দেহের কিছু দেখিনি।

খাওয়া টাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। এঁটো সরিয়ে এসে শিউলি বলেছিল, শোবে কোথায়?

—বিছানা তোমার। তুমি বিছানায় শোও। আমি মাটিতে শুচ্ছি।

—মাটি খুব নিরাপদ নয়। একতলা মেঝে তো, ড্যাম্প। তার ওপর ইঁদুর আরশোলারা তো আছেই। তোমার চেহারা দেখেই বোঝা যায় বড় ঘরের ছেলে। সহ্য হবে না। তুমি বিছানাতেই শুয়ে পড়। একরাত আমি কোন রকমে কাটিয়ে দোব।

—তারপর তোমার নিমুনিয়া হলে, পেট চলবে কী করে? শোন শিউলি, অনেক কষ্টের কথা মাথায় রেখেই হাতে বোমা আর পাইপগান তুলে নিয়েছি। ধরা পড়লে আরো স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে দিন রাত কাটাতে হবে। আমায় একটা মাদুর দাও। তাহলেই হবে।

—তার চেয়ে এক কাজ কর। ডবল বেড খাট। চল একসঙ্গেই শুয়ে পড়ি। তবে বাপু কাল ভোর হলেই পালাবে কিন্তু।

আর কোন কথা না বলে দুটো মাথার বালিশ পাশাপাশি রেখে ও দিব্যি শুয়ে পড়ে। অবনী তখন ভয়ে কাঠ। একটা মেয়ের সঙ্গে বাকীরাত একসঙ্গে শুতে হবে। ইতস্তত করেছিলেন অবনী।

—এসো এসো। তুমি না চাইলে আমি তোমার গায়ে হাতটিও দোব না। পুরুষে আমার অরুচি ধরে গেছে।

অগত্যা তাই করতে হয়েছিল। বাকী রাতটুকু বিছানার একধারে প্রায় সিঁটিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন অবনীমোহন। ঘুম ভেঙেছিল শিউলির ডাকে, এবার উঠুন ভীষ্মদেব। ভোর হয়ে গেছে।

সেই একবারই দেখা। কিন্তু কোনদিনও অবনীমোহন শিউলির মুখ ভুলে যাননি। সে রাতে মেয়েটি তার সমূহ বিপদ জেনেও সম্পূর্ণ অপরিচিত এক যুবককে আশ্রয় দিয়েছিল। ধরা পড়লে কপালে তাদের দুজনেরই শাস্তি বাঁধা ছিল।

সেই শিউলির সঙ্গে হঠাৎ দেখা। নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর অবনীমোহন কোনরকমে একটা চাকরি পেয়েছিলেন। প্রেসের প্রুফরীডার। যৎসামান্য মাইনে। কায়ক্লেশে দিন চলা।

তাছাড়া তখন তিনি সব বন্ধন কাটিয়ে এসেছেন।

প্রত্যক্ষ রাজনীতির উদ্দীপনাটা চলে গেলেও, বীজমন্ত্রটা মাঝে মাঝেই তাঁকে ভাবাতো। দিন যত এগিয়ে যাচ্ছিল অবনীমোহনের মনে হত স্হীতিশীলতা ফিরে এসেছে বলে মানুষ যতই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলুক না কেন, সেটা আসলে বাইরের চেহারা। ভেতরে ভেতরে ভাঙ্গচুর কিন্তু বেড়েই চলেছে। আশির দশকে পা দিয়ে সাধারণ মানুষ কিন্তু ক্রমশই বদলাতে শুরু করেছে। তাদের চিন্তায়, দৃষ্টিভঙ্গীতে ঘটে যাচ্ছে অনেক পরিবর্তন। অর্থনৈতিক বৈষম্য আরো অনেক বেশী অ্যাকিউট। যারা একদিন ছিল মধ্যবিত্ত আজ তারা নিম্নবিত্তের দিকে এগিয়ে চলেছে। আর অন্যদিকে যারা ছিল উচ্চবিত্ত তারা সব ফুলে ফেঁপে উঠছে। অবস্হার সুযোগ নিয়ে তারা সব হয়ে উঠছে এক একটি রাঘব বোয়াল। তাদের হাঁ মুখ ক্রমশই বিশাল থেকে বিশালতর হয়ে উঠছে।

রাজনীতির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আরো ভয়ানক। আজকের নেতাদের আদর্শহীনতা, দুর্নীতি, দলবাজি, ধীরে ধীরে এমন একটা জায়গায় চলে যাচ্ছে, এমন একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করছে, যেখানে দাঁড়িয়ে দিন আনা দিন খাওয়া মানুষ কিছুই আশা করতে পারছে না। পুরনো মূল্যবোধগুলো সব ভেঙ্গে যাচ্ছে। ধীরে হলেও পদক্ষেপে স্হির। সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছে না মূল্যবোধ না থাকলে সামাজিক সমস্ত কাঠামোই ভেঙ্গে পড়বে। জটিল হয়ে যাবে সম্পর্কগুলো। মানুষ ক্রমশ হয়ে উঠবে স্বার্থসর্বস্ব। আরো একটা মজার জিনিষ লক্ষ্য করে অবনীমোহন চমকে ওঠেন। অদ্ভুত এক সহাবস্হাননীতি মেনে চলেছেন কী বাম কী ডান সাংসদেরা। সকালে প্রতিবাদ মিছিল, রাতে মদের টেবিলে দুই জিগরি দোস্ত! হয়? নাকি এমন হবার কথা তাঁর স্বপ্নে ছিল?

প্রথম প্রথম আত্মগ্লানিতে মন খারাপ হয়ে উঠত। এখন অবনী মোহন এসব আর ভাবতে চান না। কিন্তু ভাবনাগুলো এসে পড়ে। ছড়িয়ে যায় অনুভূতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে। তখনই তাঁকে কীরকম পাগল পাগল লাগে। ভেতরের সেই বিপ্লব উদ্দীপিত একুশ বছরের ছোকরাটা মাঝে মাঝে খেপে উঠতে চায়। এখনই এর প্রতিকার না করলে, এরা ভাইরাসের মতো ছড়িয়ে পড়বে দ্রুত

থেকে দ্রুততর।

কিন্তু সব প্রতিবাদের শক্তি নিঃশেষিত। এতদিনে তিনি বুঝতে পারেন, একটি হঠাৎ আবেগের স্ফুলিঙ্গ সাময়িক কিছু আগুন জ্বালাতে সক্ষম হলেও শেষ পর্যন্ত তা দাবানল হয়ে উঠতে পারে না যদি না সুপরিকল্পিত স্ফুলিঙ্গ রসদে দাবানলের সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তোলা যায়।

অস্থির ভাবনায় অসংযত অবস্থায় এলোমেলো ঘুরছিলেন গঙ্গার ধারে। সন্ধ্যা রাতের গঙ্গার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকলে ধীরে ধীরে চাঞ্চল্য কমে আসে। ঠিক তখনই একটি বছর তিন চারেকের ফুটফুটে মেয়ে এসে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার শুরু করে আধো আধো কলকলানিতে, কাকূ, কাকু, কি করছ এখানে একা?

আদর করে মেয়েটিকে সামনের দিকে টেনে এনে অবনী তাকে কোলের ওপর বসান। হাওয়ায় তার চুলগুলো উড়ে এসে মুখের ওপর পড়ছিল। সেগুলো সরিয়ে দিতে দিতে অবনী বলেন, তুমি কে গো? কাদের বাড়ির মেয়ে? কোথায় থাকো?

মেয়েটি উত্তর দেবার আগেই মেয়ের মা এসে হাজির, আপনাকে বুঝি বিরক্ত করছে। কিছু মনে করবেন না। ও ওই রকমই।

—না না, বিরক্ত হব কেন, বলে মুখ তুলে তাকাতেই চমকে ওঠেছিলেন অবনীমোহন। বড় চেনা। বড়ো চেনা এ মুখ। কোথায়, কোথায় যেন দেখেছেন।

—থাক, আর মনে করার চেষ্টা করতে হবে না। আমি শিউলি।

নিমেষে মনে পড়ে যায়। দুটি মেয়েই তো এসেছিল তাঁর জীবনে। একজন বিপ্লবের স্বপ্নে ভালবাসাকে খুন করে কোথায় হারিয়ে গেছে, রমিতা। আর একজন মাত্র একরাতের আধা পরিচয়, বিপ্লব টিপ্লব নিয়ে যে মাথা ঘামায় না বা যার বুদ্ধিতে আর বিদ্যায় ওসব কুলোয় না, যে জানে গতর যদ্দিন পেট তদ্দিন, সেই শিউলি। তার সঙ্গে তাঁর ভালবাসার কোন সম্বন্ধ নেই, যা ছিল তা মানবিকতার স্পর্শে মহীয়ান।

কণ্ঠে বিস্ময় ফুটে উঠেছিল অবনীমোহনের, তুমি? শিউলি?

—যাক, তাহলে এই খারাপ মেয়েটাকে মনে আছে ?

—তুমি খারাপ হলে ভালো কে ?

—আবার সেই মনভোলানো রঙচঙে কথা ?

কিন্তু সেটাই সত্যি।

—জানিনা, ভদ্রলোকেদের আমি ঠিক চিনতে পারিনা তাদের কোন্ কথাটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যে। কিন্তু তোমার এ কী চেহারা হয়েছে অবনীবাবু ?

—তুমিও তো চেহারায় অনেক বদলেছ শিউলি।

—বড় ধকল যায় না এই শরীরটার ওপর দিয়ে।

—তার থেকেও আরো বড়ো ধকলের ঝড় বয়ে গেছে এই শরীরের ওপর দিয়ে।

—জানি অবনীবাবু, এসব আমি পড়েছি। খবরের কাগজে।

—তুমি লেখাপড়া জান ?

—ঐ খবরের কাগজ পড়ার মতো বিদ্যে। ক্লাশ এইট পর্যন্ত পড়েছিলাম তো।

—বাদাম ভাজা খাবে ?

—সে রাতের খাওয়ার প্রতিদান কী শুধু বাদাম ভাজায় হয় ?

—হ্যাঁ হয়। আমি বাদাম খাব, ছোট্ট টুকটুকিটা হঠাৎ তীব্র জেদ ধরে বসে, বাদাম কেনো কাকু।

বাদাম খেতে খেতে ছোট্ট মেয়েটা একসময় অবনীর কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিল। অবনী তারপর জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কিন্তু শিউলি, তুমি বললে না তো, এমন সুন্দর ফুটফুটে একটা মেয়ে, এ তোমার মেয়ে ?

—সে যে অনেক কথা অবনীবাবু। তবে বড় দুঃখী মেয়ে।

—কিন্তু দেখে তো মনে হয় না।

—ওপরটা দেখে কী সবার সব কিছু জানা যায় ?

—না জানা যায় না। কখনোই যায় না। বলো ওর কথা।

—তোমার সময় নষ্ট হবে না ?

—সন্ধ্যের পর আর আমার সময় কাটতে চায় না।

শিউলি খানিকক্ষণ সময় নিয়েছিল। তারপর মেয়েটার মাথায়

আলতো করে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেছিল, অবনীবাবু, মানুষের চোখে আমরা খারাপ আর নোংরা। . আবার আমাদের ছাড়া তোমাদের সুন্দর করে সাজানো সমাজও চলবে না। আমরা তোমাদের ব্যাভিচার আটকাই। আমরা না থাকলে ঘরের বউ মেয়েদের সতীত্ব থাকবে না এসব বুলি অনেক শুনেছি। কিন্তু আমাদের জন্ম তো তোমাদের থেকেই। কোন মেয়েই তো বেশ্যা হবার জন্যে জন্ম নেয় না। বেশ্যা তৈরী হয় ভদ্রলোকের পাপ থেকে। যেমন এই বাচ্চা দুধের শিশুটাকে বেশ্যা করার জন্যে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল হয়তো ওর বাবা মা।

—ফেলে দিয়ে গিয়েছিল মানে ?

—কোন ভদ্রবাড়ির ভদ্রছেলেমেয়ের সুকীর্তির ফসল। একদিন ভোররাতে শম্ভু দালাল ওকে কুড়িয়ে পায় আঁস্তাকুড় থেকে। সবে জন্মেছে। গায়ে তখনও রক্তের দাগ। ভালো করে পরিস্কার না করেই বোধহয় আবর্জনায় মিশিয়ে দিতে চেয়েছিল।

—গল্পের মতো মনে হচ্ছে।

—গল্প নয় অবনীবাবু। এ সবই সত্যি। ভাগ্যিস শম্ভু সেদিন বাড়িওলি মাসির কাছে ওকে নিয়ে যায়নি। সরাসরি নিয়ে এসেছিল আমার কাছে! জানিনা এর পর ওর বরাতে কী আছে।

—বুঝলাম। কিন্তু এতোদিন ধরে ওকে রেখেছ কার কাছে ? তোমার ওখানে থাকলে তো,

—জানি। আর একটা শিউলির জন্ম হবে। ওকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম আমার বুড়ি মায়ের কাছে।

—তোমার মা, মানে ?

— কেন বেশ্যার মা থাকে না ?

—শিউলি, আমার সঙ্গে এভাবে কথা বোল না। বেশ্যাদের আমি ঘেন্না করি না। তা যদি করতাম তাহলে সেদিন তোমার হাতের তৈরী রুটি আলুরদম খেতাম না। একই সঙ্গে সারারাত তোমার সঙ্গে একই বিছানায় শুয়ে থাকতে পারতাম না। এতোদিন পর দেখা হলেও চিনে না চেনার ভান করে চলে যেতে পারতাম।

—শুয়ে থাকার কথা আর বোল না, হেসে ফেলে শিউলি বলে

ছিল, সারারাত বিছানার একধারে কুঁকড়ে কোন রকমে রাত কাটিয়েছিলে।

—সেটা ঘেন্নায় নয়।

—জানি গো অবনী বাবু জানি। একটু আধটু মানুষ চিনতে আমিও পারি।

—তারপর কী হল বল? তোমার মা কোথায় থাকেন? তোমার এই প্রফেশানের কথা তিনি জানেন?

—না জেনে উপায় নেই। তাঁর করারও কিছু নেই।

—কিন্তু, কথাটা অনেকবার জিজ্ঞাসা করব ভেবেও জিজ্ঞেস করা হয়নি।

—অনেকবার মানে? তোমার সঙ্গে তো আমার মাত্র দুবার দেখা হল।

—তা বটে। তবে ওইটুকু সময়ের মধ্যেই এ কথাটা জিজ্ঞাসা করা যেত।

—কী কথা?

—তোমাকে দেখে ভদ্রঘরের মেয়ে বলেই মনে হয়। অন্তত একটা বিশেষ ছাপ এখনও পড়েনি। তাই জিজ্ঞাসা করছি, তুমি তো কোন ভালো ঘরের বউ হ'তে পারতে!

—এখনও তো পারি।

—কী রকম?

—তুমি যদি আমায় বিয়ে কর।

জীবনে বোধ হয় সেই প্রথম অবনীমোহন হোঁচট খেয়েছিলেন। একদিন শ্রেণীহীন সমাজ তৈরীর স্বপ্ন দেখেছিলেন। শোষণ আর শাসনের যন্ত্র পাল্টে ফেলতে চেয়েছিলেন। মানুষকে দিতে চেয়েছিলেন সমান অধিকার। সেই মুহূর্তে মারাত্মক একটা পরীক্ষার সামনে ফেলে দিয়েছিল শিউলি। মিনিট খানেক নীরব থেকে বিহ্বল চোখে শিউলির দিকে তাকাতেই, শিউলি হো হো হেসে উঠে বলেছিল, তুমি কী পাগল হলে অবনীবাবু? তাও কী কখনও হয়? আর আমাদের জীবনটা খাঁচায় পোরা জন্তুর মতো। এখানে আসাটা যত সহজ বেরুনোটা তার থেকে অনেক শক্ত। যেদিন বেরুতে পারব সেদিন দেখবে এ দেহটা ব্যবহারে

ব্যবহারে ক্ষয়ে শেষ হয়ে গেছে। যাক সে কথা, যা বলছিলাম, আমায় কেউ ফুসলে বার করে নিয়ে আসে নি। বিয়ে করব বলে কেউ এখানে বিক্রিও করে দেয়নি। পর পর দুটো অ্যাকসিডেণ্টে আমার বাবা আর দাদা মারা গেছিল। থাকতাম মানিকতলার এক বস্তিতে। ওদের সৎকার করার টাকাও পাড়ার ছেলেরা চাঁদা করে জুটিয়েছিল। বাবা মরেছিলেন যক্ষ্মায়। আর দাদা, কী জানি কী সব পার্টিটার্টি করতো। একদিন সকালে ফিরেছিল লাশ হয়ে।

-- বেশতো, তুমি এ লাইনে এলে কীভাবে?

—মেয়েদের পক্ষে এটাই টাকা রোজগারের সব থেকে সহজ রাস্তা। হাতে খড়িটা হয়েছিল দাদার এক বন্ধুর কাছে। ছেলেটা আগে ভালোবাসাটাসার কথা বলত। কিন্তু মতলবটা বোঝার বয়েস আমার হয়েছিল। দু একদিন কাছাকাছি থাকার পর যেদিন প্রথম চুমুটুমু খেতে এসেছিল, সেদিনই বলে দিয়েছিলাম ফেল টাকা মাখো তেল। যেমনটি দেবে তেমনটি পাবে। প্রথম প্রথম দিত, কিন্তু যা দিত তাতে মা আর মেয়ের সংসার চলতো না। এরপর বাইরে বেরুনো শুরু করলাম। তাতে আয় কিছু বেড়েছিল। কিন্তু রানিং খদ্দের, সিনেমা নয়তো ভাড়া করা ঘর। তাও সেখানে পুলিশ বাবুদের দিতে হোত ভাগ। শেষকালে এক বাবু, বোধ হয় আমাকে তার মনে ধরেছিল, পোড় খাওয়া ঝানু লোক, একদিন সিনেমা হলে নিয়ে গিয়ে স্পষ্ট বলেছিল, আমি যদি চাই তাহলে সে আমার পার্মানেণ্ট একটা ব্যবস্হা করে দেবে। তবে সে এলে তাকে আগে খাতির করতে হবে। তারপর সোনাগাছির এক মাসীর ডেরায় এনে তুলল। তবে শর্ত ছিল মাসে তিনদিন আমি মাকে দেখতে যাব। যে তিনদিন ছেলেরা মেয়েদের ছুঁতে চায় না।

—বুঝলাম। কিন্তু সত্যিই তুমি আমায় বিয়ে করতে চাও? কিন্তু আমার তো তোমাকে দেবার মতো কিছু নেই। এই বয়েসেই, শরীর গেছে, মন গেছে, শক্তিও গেছে। রোজগার করে যে তোমাকে খাওয়াব পরাবো সে সংগতিই বা আমার কোথায়?

শিউলি আবার হেসে উঠেছিল, তুমি কী ভাবলে সত্যিই আমি তোমাকে বিয়ে করতে চেয়েছি? পাগলাবাবু, আমি তো

জানি তুমি খুব ভালো লোক। মানুষের ভালোথাকার জন্যে একদিন নিজেদের শেষ করে দিতে চেয়েছিলে। আমি তো জানি তোমার মনে কোন পাপ নেই। বিয়ের কথা আমি বলেছিলাম একটা বিশেষ কারণে।

—কী কারণ?

—মায়ের অনেক বয়েস হয়ে গেছে। তবুও আঁস্তাকুড়ে পাওয়া মেয়েটাকে আমি বাঁচাতে চেয়েছিলাম মায়ের কাছে রেখে। ইচ্ছে ছিল ওকে লেখাপড়া শেখাবো, মানুষ করব। কিন্তু,

—কিন্তু?

—মায়ের শরীরের অবস্থা ভালো নয়। যে কোনদিন চলে যেতে পারেন। তখন এর কী হবে? ফেলে তো দিতে পারব না। তাহলে সেই এহাত ওহাত হ'তে হ'তে এখানে কিংবা আরো বীভৎস কোন নরকে গিয়ে উঠতে হবে। তার ওপর মেয়েকে যা দেখতে সুন্দর হবে। নিশ্চয় কোন বড় ঘরের মেয়ে। তাই চেয়েছিলাম,

—কী?

—কোন বিশ্বাসী কারো হাতে ওকে তুলে দিতে। পারনা তুমি ওর বাবা হ'তে?

—শিউলি?

—যতই কেন মায়ের পরিচয়ে পরিচিত হবার আইনটাইন নিয়ে লোকে হুজুগ তুলুক, মনে মনে সবাই চায় তার পিতৃ পরিচয়। তাছাড়া আমিও তো পারিনা মা বলে পরিচয় দিতে। মেয়েটাই বা কোন মুখে সবাইকে বলবে আমার কোন বাবা নেই, আমি এক বেশ্যার মেয়ে!

হঠাৎ কথা ঘুরিয়ে অবনীমোহন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমাদের শম্ভু দালালের সঙ্গে দেখা হতে পারে কী?

—কি হবে তার সঙ্গে দেখা করে?

—হয়তো কিছু হবে অথবা হবে না। তবু চেষ্টা করতাম জানতে লোকটা সত্যিই একে কোথা থেকে পেয়েছিল।

—তাতে লাভ?

—ওর সত্যিকার বাবা মাকে খুঁজে পাওয়া।

—প্রথমত সেটা অবাস্তব। আর পেলেও তারা মানবে কেন?

কলঙ্ক একবার ঘাড় থেকে নামাতে পারলে কেউ কী আবার সেধে তাকে ঘরে নিয়ে আসে ?

—হুঁ, কিন্তু সত্যটা জানার দরকার।

—আমার কথার উত্তর না দিয়ে এড়িয়ে যেতে চাইছ অবনীবাবু !

—না। এড়াইনি। আমাকে অন্তত একদিন ভাবার সময় দাও।

—মাত্র একদিনই পাবে। মাসে তিনদিন ছুটির দুদিন কেটে গেছে। ভাগ্যিস মেয়ে আবদার ধরেছিল গঙ্গা দেখব তাই তোমার সঙ্গে দেখা হল। একদিন পর, মানে পরশু আমায় কি ভাবে খবর দেবে ?

—তুমি তো এখন সেই বাড়িতেই আছ ?

—আছি, তবে এখন আমার কিছু জৌলুস বেড়েছে। দেখতে শুনতে তো আমি খুব একটা খারাপ নই, তুমি কী বল ?

—কি জানি। ঠিক আছে, পরশুদিনই তোমার সঙ্গে দেখা হবে। আমার এই রকম পোষাকে ঢুকতে দেবে তো ?

—গেলেই বুঝতে পারবে।

হঠাৎ অহনার গলা পেয়ে সম্বিত ফিরে আসে অবনীমোহনের। দরজার কাছে কোমরে হাত ঠেকিয়ে বলছে, অন্ধকারে ভূতের মতো বসে বসে সেই আবোল তাবোল কথা ভেবে যাচ্ছ ?

—অন্ধকার নয় তো, লোডশেডিং।

—অনেকক্ষণ আগে আলো এসে গেছে।

—তা হবে। আলোটা জেলে দে। কটা বাজলো ?

—দশটা বেজে গেছে।

—এতো রাত পর্যন্ত বাইরে থাকিস ? দিনকাল ভালো নয়।

—তুমি বড়ো বেশি বেশি চিন্তা কর। আমায় দুটো টিউশন সেরে ফিরতে হয়।

অবনীমোহন আর কিছু বলেন না। খানিকক্ষণ ঝিমু মেরে বসে থাকেন। অহনা হাত মুখ ধুতে চলে যায়। খানিকক্ষণ পর ফিরে আসে। হাতে দু পেয়ালা চা।

—আবার এতো রাতে চা করলি ?

—সন্ধ্যে থেকে তো সেটাও জোটেনি।

—আমার সবই অভ্যেস আছে।

চা খাওয়া শেষ করে অহনা উঠতে যাচ্ছিল। অবনীমোহন হঠাৎই ওর একটা হাত চেপে ধরে বলেন, যদ্দিন তোর একটা ব্যবস্থা করতে না পারছি তদ্দিন চিন্তা তো থাকেই।

—চিরকাল একই কথা শুনিয়ে এসেছে বাপঠাকুর্দারা আর মেয়েরা যতই শিক্ষিত হোক ঐ এক কথা তাদের শুনে যেতেই হবে। আমাদের দেশটা যতই অ্যাডভান্স হবার ঢাক পেটাক, এখনও এই জায়গায় দু পাঁচশ বছর স্ট্যাগন্যান্ট্ হয়ে আছে।

—বক্তিমে করছিস ?

—না। সত্যিটা তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

—সুমনকে অনেকদিন দেখছি না। আসেনা ?

—আসতে বারণ করে দিয়েছি।

—সত্যি কথাগুলো বোলে ?

—সেগুলো শোনানোর তো কোন দরকার নেই।

—নেই ? সুমনকে তো তুই পছন্দ করতিস। ভেবেছিলাম,

—তোমাকে একটা রিকোয়েস্ট করব ?

—বল।

—আমার বিয়ের ভাবনাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেল।

—কিন্তু একজনকে যে আমি কথা দিয়েছি। সে যে আমার আশায় বসে আছে।

—কে সে ?

—বোলব। তোকে একদিন সবাই বলব।

—তুমি কি বলবে আমি জানি। আঁস্তাকুড় থেকে একটা লোক আমাকে কুড়িয়ে নিয়ে একটা বেশ্যার হাতে তুলে দিয়েছিল,

অবনীমোহন অনেকদিন ক্ষোভ আর রাগকে বিসর্জন দিয়েছেন। সাতষট্টি আটষট্টি সালের ফুটন্ত রক্তে ছিল দাবানল সৃষ্টি করার ফুয়েল। সেটা যেদিন ফুরিয়ে গেছে সেদিন থেকে মানুষের ওপর থেকে সব রাগ, বিদ্বেষ সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। ফুরিয়ে যাওয়া মানুষের তো দেবার কিছু থাকে না। কিন্তু হঠাৎই অহনার একটা কথায় রাগ নামের অনুভূতিটা মাথায় চড়ে বসল। বেশ ধমকের ভঙ্গীতে অবনী বললেন, বেশ্যা শব্দটা আর আমার সামনে উচ্চারণ করো না। ঐ মেয়েটি ছিল

বলেই এখনও তুমি পৃথিবীর আলো দেখছ ।

ঠোঁট উল্টিয়ে অহনা বলে, সেটাই বোধ হয় সব থেকে অন্যায় কাজ করেছেন তোমার ঐ বারাঙ্গনা দেবীটি। জগতে যার কোন পরিচয় নেই, যে জানেনা কে তার বাবা মা, তার তো বাঁচার কোন দরকার ছিল না ।

—আছে অহনা আছে, একটি সুস্থ জীবনের দরকার আছে ।

—হ্যাঁ, সুস্থ জীবনের। কিন্তু আমার মতো নামগোত্রহীনের জীবন নয়। তুমি কী মনে করো একটি মানুষের সামাজিক পরিচয়ের কোন প্রয়োজন নেই ? কুকুরদেরও তো পেডিগ্রি দেখা হয় ।

—ওটা হচ্ছে বুর্জোয়া সিস্টেমের ফল। সামন্ততান্ত্রিক ভুয়ো আভিজাত্যের ফলশ্রুতি। কোন মানুষই তার জন্মের জন্যে দায়ী নয়। তুমিও নও। জন্মটা একটা অকারেন্স্। রেজাল্ট অব সেক্সুয়াল ইউনিয়ন। একটা ন্যাচারাল ফেনোমেনান।

—হ'তে পারে। কিন্তু বিদেশে ব্যাড প্রোডাক্টকে বাতিল বলে ফেলে দেওয়া হয় ।

—বিকজ, সেগুলো মেটিরিয়াল প্রোডাক্ট। যার কোন প্রাণ নেই, অনুভূতি নেই, ইনভ্যালিড্। কিন্তু তুই তো লিভিং বীইং, উইথ ফুল সেন্স এ্যাণ্ড কনসায়েন্স। তাছাড়া,

—তাছাড়া কী ?

—আমি তো তোর পরিচয় দিয়েছি। নাম দিয়েছি। পদবী দিয়েছি। শিক্ষা দিয়েছি। তাহলে কী আমায় জানতে হবে, আমার দেওয়া সব শিক্ষাই মূল্যহীন ? গ্রহণযোগ্য নয় ?

—কিন্তু সেটা দাঁড়িয়ে আছে মিথ্যের ওপর। এককালে তুমি একটা শ্রেণীহীন বৈষম্যহীন সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলে। মিথ্যের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা পরিচয়টা কী সত্যের আঘাতে পলেস্তারা ধরে রাখতে পারবে ?

—আমারও তো সেই বক্তব্য অহনা। সুমনকে তুই সরিয়ে দিস না। ওর কাছে নিজের জীবনের সব কিছু খুলে বল। ভালোবাসার পরীক্ষাটাও তো হয়ে যাবে।

—ভালোবাসা নয়। করুণার আতিশয্য দেখাবে হয়তো। আমার সর্বদাই মনে হবে সে আমাকে উদ্ধার করছে। তারপর

কোনদিন এতটুকু ত্রুটি বিচ্যুতি দেখলে প্রতি মুহূর্তে খোঁটা দেবে। না, সে আমার সহ্য হবে না।

—সেটা নাও হতে পারে।

—সেটাই হয়।

—জীবনে আমার ভুলের শেষ নেই। আমি চাই না এলোমেলো ভাবনায় তুই একটা ভুল করে বসিস। তাছাড়া, আমি বুঝতে পারছি, আমার জীবন আস্তে আস্তে শেষ হয়ে আসছে। তিন বছর বয়েস থেকে তোকে আমি মানুষ করেছি। এ হাত একদিন ঘাতকের কাজ করেছিল। তবু কসাইও তার ছেলেমেয়েকে সেই হাত দিয়েই আদর করে। সেখানে কোন ফাঁক থাকে না।

—তুমি কী বলতে চাইছ বলতো ?

—তোর সঙ্গে আমার রক্তের সম্বন্ধ নেই এটা সত্যি। যে সত্যিটা তোকে বলা উচিত, সেটা বলেছি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তুই আমায় অযথা শাস্তি দিবি। যেমন রমিতা দিয়েছিল।

—রমিতা কে ?

—যাকে আমি ভালবাসতাম। যার তাগিদে আমি একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলাম।

—সে সব জানি, কিন্তু তোমার ভালোবাসাটা কী হ'ল ?

—রমিতা ভালোবাসার থেকে বেশি মূল্য দিয়েছিল তার আদর্শকে। আদর্শের জন্যে সে আমাকে খুন পর্যন্ত করতে চেয়েছিল। তার শেষ পরিণতি কী হয়েছে তা আমার জানা নেই। তাহলে অন্তত বুঝতে পারতাম সে তার বিশ্বাসে কতটা অমলিন ছিল বা আছে।

—হঠাৎ তুমি রমিতাদেবীর কথা তুললে কেন ?

—প্রথম প্রেম কী কেউ ভুলতে পারে ? তাছাড়া আমি ভালবাসাকে মূল্য দিই বেশি। আমি জানি সেদিন আদর্শের জন্যে জীবন নিয়ে জুয়া খেলিনি। চেয়েছিলাম একটি মেয়ের কাছে ভালোবাসার শিভ্যালরি দেখাতে। আমাদের মতো হুইমজিক্যাল এ্যাণ্ড ইমোশানালদের কিছু হয়না জানি। তবু কোথাও যেন আমি এক জায়গায় সৎ ছিলাম। একনিষ্ঠ ছিলাম।

তাই আমি অত্যাচারের মুখেও রমিতার নাম উচ্চারণ করিনি। জেল থেকে বেরিয়ে এসে এই কুড়ি বছরে জনগণকে মিথ্যা স্তোক দিয়ে ভণ্ড রাজনীতির পাণ্ডা হতে পারিনি। একটা বিশ্বাসে আমি আজও স্থির। ভালোবাসায়। তাই বোধ হয় রমিতার থেকেও শিউলি আমার কাছে পতিতা হলেও অনেক আপন। তুই আমার রক্তের কেউ না হয়েও অনেক কাছের আর নিজের।

আপন মনে বকতে বকতে হঠাৎ পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখেন ঘর ফাঁকা। অহনা সম্ভবত রান্না ঘরে চলে গেছে। অবনী মনে মনে ভাবতে থাকেন, অনেকদিন শিউলির সঙ্গে দেখা হয়নি। একবার দেখা হওয়া দরকার।

তিন

দলের ছেলেরা শুনে সবাই মিলে হৈ হৈ করে উঠল। সুরকার নিলয় মুখার্জি তো বলেই ফেলল, সুমনদার এরকম একটা ব্রেক জীবনে আসবে তা জানতাম।

বিনম্র ভট্টাচার্য, সেকেণ্ড লিডিং রোলগুলো বলতে গেলে সব নাটকেই ওর বাঁধা। সব রকম জটিল রোলে ও বিশ্বস্ত। সুমনের দিকে তাকিয়ে বিনম্র বলে, দাদা, তুমি অ্যাকসেপ্ট করে নাও। তারপর যখন তুমি ওদিকে হেভি বুক্‌ড্ হয়ে যাবে তখন তোমার রোলগুলো তো আমাকেই করতে হবে। বলতো এখন থেকে এন্‌টায়ারলি ডিভোটেড হয়ে যাই।

—কেন এতদিন কী ফাঁকি দিয়ে পার্ট করতিস, সুমন ঠাট্টা ঠাট্টা গলায় বিনম্রকে রাগাতে চাইল।

—সেটা করি না, তা আমার থেকেও তুমি বেশি ভালো জানো।

—মহিলাটি কেমন? বেশ গম্ভীর গম্ভীর গলায় সেক্রেটারি স্বজন দে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় বিজ্ঞজনোচিত জিজ্ঞাসা রাখেন।

সুমন মুখ তুলে দেখে স্বজন যথারীতি গাম্ভীর্যের আড়ালে।

—একদিনে কী চিনবো বল? তবে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা সত্যি হলেও হতে পারে।

—কিন্তু মহিলা সম্বন্ধে বাজারে কিছু গসিপ আছে।

—থাকতে পারে তাতে আমার কী এলো গেলো?

—তুমিতো বাবা ভীষ্মের কাছে নাড়া বেঁধে তাঁর চেলা হওনি। নিলয় ফুট্ কাটে, পুরুষস্য ভাগ্যম, স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম।

—এখন উল্টে গেছে। পুরুষস্য চরিত্রম্ দেবা ন জানন্তি সে যাক, যাই করো বাবা, দলটি ডুবিও না। টেনে হিঁচড়ে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি চলে গেলে একেবারে কানা হয়ে যাবে।

—স্বজনদা, এটা তোমার ভুল। আজ আমরা এমন একটা পিরিয়ডে এসেছি, যখন টিভির রমরমা। একবার টিভির পর্দায় মুখ দেখাতে পারলে মনে করে জীবন ধন্য হয়ে গেল। কিন্তু স্টেজকে যারা ভালবেসেছে, অভিনয়ের কাছে যারা দায়বদ্ধতা স্বীকার করে তারা স্টেজের মায়া কাটাতে পারে না। আমার পক্ষে তো নয়ই। তাছাড়া ওদিক থেকে টাকাকড়ি যদি তেমন ইনকাম হয় তখন শো করার জন্যে এত ভিক্ষেটিক্ষে করতে হবে না।

—সেটা ভবিষ্যতই বলবে, গুরুগম্ভীর গলায় আবার প্রশ্নের ফ্যাকরা তোলেন স্বজন দে, কিন্তু তোমার হিরোইন কী রাজী হবেন?

—হিরোইন, আকাশ থেকে পড়ে সুমন, আমার আবার হিরোইন কে? নন্দা আমার সঙ্গে করে টরে বটে, তাবলে?

—আরে পাঁঠা আমি নন্দার কথা বলছিনা, বলছি তোমার অহনা দেবী আপত্তি করবে না? ওতো আবার ভালোরকম সেণ্টিমেণ্টাল। তার ওপর অভিনয় টভিনয় তেমন পছন্দ করে না। বলেছিস ওকে?

অহনার প্রসঙ্গ উঠতেই সুমন গুম মেরে যায়। মিনিট খানেকের মধ্যে অবস্থাটা কাটিয়ে ওঠে। তারপর স্বজনের দিকে তাকিয়ে কিছু হয়নি এমন একটা ভাব ফিরিয়ে এনে বলে, সে সব কিছু নয় স্বজন দা, দেখা হলেই বলব। সে যাক আমায় এবার বাড়ি ফিরতে হবে। তোমরা শো-এর ডেট ঠিক করো। 'শরশয্যায় ভীষ্ম'ই হবে। রিহার্সালের ডেট ঠিক করে আমায় জানিও। নেকস্ট্ উইক থেকে মহড়া হবে। সবাইকে খবরটা জানিয়ে দিও। নন্দাকে বোলো পার্টটা যেন আর একটু মুখস্ত করে। মাঝে মাঝে ওর ব্ল্যাঙ্ক্ হয়ে যায়। গুড নাইট এভরিবডি।

সুমন আর কিছু না বলে বেরিয়ে আসে। অহনার খচ্খচানি মন থেকে কিছুতেই যাচ্ছেনা। সে ভেবেই পায় না অহনা হঠাৎ

তার সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করল কেন? মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে এমন কী ঘটল যে এরকম অ্যাবরাপ্ট চেঞ্জ!

অহনার সঙ্গে তার সম্পর্ক তো আজকের নয়। বেলেঘাটা নিউ সি আইটির বাড়িগুলো তৈরী হয়েছিল লোয়ার মিড্‌ল্‌ ক্লাশ মানুষদের জন্যে। অত্যন্ত সস্তা ভাড়ায় মানুষের বাসযোগ্য কিছু খুপরি। একটা করে ঘর, একটা লাগোয়া রান্নাঘর আর বাথরুম। বাথরুম না বলে পায়রার বাসা বলা যেতে পারে। তারই মধ্যে মানুষ গুঁতোগুঁতি করে থাকে। হ্যাঁ থাকে। বাস করা যাকে বলে তা নয়। তবু চলে যাচ্ছে। এই শহরে এত কম ভাড়ায় আর কোথাও এর থেকে ভদ্রভাবে মানুষ বাঁচতে পারে না। অ্যালটমেণ্টটা ছিল দাদার নামেই। দাদা বৌদি আর মাকে নিয়ে তারা চারজন ঐ ঘুপচি ঘরের বাসিন্দা হতে একদিন সি আই টি কোয়ার্টারে উঠেছিল তখন ওর কতই বা বয়েস। বছর পনেরো ষোল।

তার কিছুদিন পরই, ঠিক তার উল্টোদিকের বিল্ডিং-এর একতলার অ্যাপার্টমেণ্টে এসে উঠেছিলেন অবনীমোহন রায় নামে এক ভদ্রলোক। সঙ্গে একটি ফুটফুটে মেয়ে। তখনও ফ্রক পরে। বয়েস বছর বারো তেরো। অবনীমোহন ভদ্রলোক এককালে নাকি উগ্রপন্থী রাজনীতি করে জেলটেল খেটেছেন। তারপর আর পাঁচজনের মতো সুযোগসন্ধানী প্রতিভায় নিজের আখের গোছাতে পারেন নি। অহনার মুখেই শোনা তার কে এক মাসীর চেষ্টায় একতলার ঐ ফ্ল্যাটটি জোগাড় করতে পেরেছিলেন। অহনা অবনীবাবুরই মেয়ে। মা মারা গেছেন অহনার ছোট বয়সেই। লোকে বলে অবনীমোহনের মাথায় ছিট্‌ আছে। অধিকাংশ সময়েই নিজের মনে থাকেন। নইলে নিজের মনেই বিড়বিড় করেন একা থাকলেই।

তারপর কেটে গেছে দশটা বছর। সেই কৈশোরেই আলাপ এবং ভালোবাসার সূত্রপাত। দশ বছরে তা আরো গভীর হয়েছে। আর ঐ বয়েসের প্রেম। মন থেকে দেহে ছড়িয়ে পড়তেও বেশি দিন লাগেনি। মোটামুটি তারা একদিন বিয়ে করবে এমনি একটা অলিখিত শপথ দুজনের মধ্যেই ছিল। কেবল সময়ের অপেক্ষা। চাকরির অপেক্ষা। তার থেকেও আরো একটা নতুন

বাধা ওদের অবাধ মেলামেশায় কিঞ্চিৎ সীমারেখা টেনেছিল।

বছর তিনেক আগে হঠাৎ একদিন সংসারের একমাত্র রোজগেরে মানুষ, দাদা, ফিরলেন বুকে অসম্ভব যন্ত্রণা নিয়ে। শেষ পর্যন্ত হসপিটাল। স্ট্রোক। মাস তিনচার কমপ্লীট রেস্টের পর কর্মস্থলে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু দুমাস পর ফের অ্যাটাক। আবার হসপিটাল। আবার অনিশ্চয়তার লুকোচুরি খেলা। সেবারও মাসখানেক পর মুক্তি পেয়ে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। কিছুদিন যেতে না যেতেই আবার বুকের যন্ত্রণা। সেবার আর বাঁচার মতো জায়গায় ছিলেন না। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট জানিয়েই দিয়েছিল, সব কিছুর জন্যে প্রস্তুত থাকতে। ফেরে না কেউ। তবু দাদা ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু একেবারে ঝরঝরে অবস্থায়। বেশী কথা বলতে পারেন না। দু পা গেলেই দমে ঘাটতি পড়ে যায়। রাস্তার ওপরও আধঘন্টাটাক বিশ্রাম নেবার পর আবার একটু হাঁটতে পারেন। সুমন নিজে একদিন ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করেছিল, দাদার অবস্থাটা ঠিক কোন জায়গায়। হসপিট্যাল ডক্টর শেষ কথাটাই বলে দিয়েছিলেন, উনি বেঁচে আছেন এটাই আশ্চর্য। যতদিন থাকেন সেটাই আপনাদের ভাগ্য।

সেই অথর্ব দাদা এখনও আছেন। সুমনের চিন্তা, দাদা চলে গেলে সব দায়িত্ব তার। অফিস থেকে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড গ্র্যাচুইটি, ইনস্যুরেন্স বাবদ যে টাকা পাওয়া যাবে, সেটা বৌদির হাতেই তুলে দেবে। বউদির এখন অল্প বয়েস। তার থেকেও বছর দুয়েকের ছোট। এখন সমাজ আর দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে মাথা ঘামায় না। বৌদির হিল্লে হয়ে গেলে, তার আর মায়ের সংসার। কিন্তু এই সব ডামাডোলে সে অহনার ব্যাপারে বেশ ধন্দে পড়ে গিয়েছিল। প্রথমত চাকরি না পাওয়া বেকার, এদিক সেদিক নাটক করে বেড়ানোটাও অহনার ঠিক পছন্দ নয়। সে সাধারণ মেয়ে। সাধারণ মানুষ নিয়েই ঘর বাঁচতে চায়। সুমনও হয়তো সেদিকেই এগুতো। একটা চাকরি পেলেই অহনাকে সে বিয়ে করে ফেলতো। অবনীবাবুর শরীর স্বাস্থ্যও একেবারে শেষপর্য্যায়ে। কখন আছেন কখন নেই।

কিন্তু একদিন সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেল। যে রহস্য আজো

ওর কাছে অজ্ঞাত। সেদিন শেষ সন্ধ্যের ঘটনা সুমনের এখনও স্পষ্ট মনে আছে। নাটকের রিহার্স শেষ করে ও বাড়ি ফিরছিল। একটু রাতই হয়েছিল। আর ফেরার পথে একবার অহনার জানলার দিকে তাকিয়ে নেওয়াটা ওর অভ্যেস। সেদিনও যথারীতি তাকিয়ে ছিল। জানলার ধারে টেবিলে বসে অহনা পড়াশুনা করছিল। সামনেই ওর পরীক্ষা। চোখাচোখি হতেই অহনা হাত নেড়ে ডেকেছিল।

অহনার বাড়িতে তার অবাধ যাতায়াত। সময় পেলেই অহনার সঙ্গে গল্প করা, তাকে রাগিয়ে দেওয়া, তারপর রাগ ভাঙ্গাতে কাছে টেনে নিয়ে আদর আর সোহাগ। এসব ব্যাপারে তখন দুজনেই অভ্যস্থ।

অবনীবাবু জানতেন তাদের মেলামেশার কথা। কিন্তু কোন এক বিশেষ কারণে তিনি কোন কিছুই দেখতেন না।

জানলার কাছাকাছি যেতেই অহনা বলেছিল, বাবি তোমায় ডাকছে। খুব বিশেষ দরকার। এ ডাকের অর্থ একটাই। সুমন তা জানতো। তবু গিয়েছিল।

অবনীমোহন তখন আর একটি জানলার ধারে ধ্যানস্থ অবস্থায় বসে থাকার চিরাচরিত ভঙ্গিমায় বসে আছেন।

—আমায় ডেকেছেন মেসোমশাই?

—কে? সুমন? শুনলাম তোমার দাদার শরীর খুব খারাপ।

—একই রকম। এই ভালো এই খারাপ। এখন তো ওঠা চলাও প্রায় বন্ধ।

—ভাববার কথা। তোমারও তো চাকরির তেমন সুরাহা হল না। হবে না। এখন ক্রিমিন্যালদের রাজত্ব চলছে। যে যত ক্রাইম করবে সে তত ওপরে উঠবে। মন্ত্রী আমলা নেতা জনদরদী দাদারা থাকতে তোমাদের মতো লক্ষ লক্ষ বেকারের কপালে ফোঁপরা। এজ অব কম্পিউটার। একটা কম্পিউটার একশো জনের কাজ করে দেবে। অতএব নো ফারদার রিক্রুটমেন্ট। সারা ভারতবর্ষে কোটি কোটি বেকার। কী করবে তারা? চুরি, ডাকাতি? তার জন্যে এলেম দরকার। সবাই পারে না। মানুষের বায়োলজিক্যাল নীডগুলো মিটবে কী করে? হয় সমাজে

করাপসান বাড়বে নয়তো নারীধর্ষণ।

—বাবি, তুমি কী এইসব বলবার জন্যে সুমনকে ডেকেছিলে? এগুলো কিন্তু ও জানে।

অহনা কখন যেন এসে দাঁড়িয়েছিল ওদের মাঝখানে।

—ভুলে যাই মা। ভুলে যাই এসব বলার সব অধিকার আমি হারিয়ে ফেলেছি। আই অ্যাম আ ডিফিটেড অ্যান্ড রিট্রিটেড সোলজার। যুদ্ধে হেরে পালিয়ে যাওয়া সৈনিক। কিন্তু ভারতবর্ষটার দিকে তাকালে শিউরে উঠি। মনের মতো কাউকে পেলে উগরে ফেলি। যাক, যে জন্যে তোমায় ডেকেছিলাম। আমি বেশ বুঝতে পারছি আমার দিন ক্রমশ এগিয়ে আসছে। কিন্তু এই মেয়েটার একটা ব্যবস্হা না করে তো কোথাও যেতে পারি না।

সুমন একবার অহনার দিকে তাকিয়ে অবনীমোহনকে বলেছিল, আপনি এত ভাছেন কেন মেসোমশাই, আমরা থাকতে ও কোথাও ভেসে যাবে না।

—আমরা বলতে?

—আমরা মানে, আমি। আর আপনি যে হতাশার ছবিটা একটু আগে তুলে ধরলেন, সেটাকে কোন ভাবেই অস্বীকার না করেই বলছি, একটা না একটা ব্যবস্হা নিশ্চয়ই হবে। বাঁচার আশা নিয়েই তো আমরা এগিয়ে চলেছি। আপনি অহনার ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন। ওর সামনেই আমি আপনাকে এই কথাটা দিতে পারি। আমার ওপর একটু বিশ্বাস রাখুন।

—রাখি এবং রাখছি। কিন্তু তার আগে তোমাদের দুজনকেই একটা জরুরী কথা জানানোর দরকার। কারণ সত্যকে কখনো গোপন করতে নেই।

—কী সত্য যা আপনাকে গোপন করতে হয়েছে?

—বলব। আরো কদিন পরে বোলব। হয়তো সে সময়টা এখনও আসেনি। অথবা আমি এখনও হাল ছেড়ে দিইনি।

অধৈর্য্য হয়ে অহনা বলেছিল, তুমি বড় হেয়ালি করতে শুরু করলে বাবি। খোলাখুলি বলেই ফেলনা বাপু কী বলতে চাও?

—বললাম তো, একদিন সবই বোলব। কেবল আমি একটি

অপেক্ষায় আছি।

সেইদিনই সুমন হঠাৎ প্রশ্ন করেছিল, আচ্ছা মেসোমশাই আপনি সর্বদাই বলেন আপনি ছাড়া অহনার আর কেউ নেই। আবার বলেন ওর এক মাসী আছে। কিন্তু সে মহিলাকে তো কোনদিনও দেখলাম না। তিনি কোথায় থাকেন?

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন অবনীমোহন। তিনি জানেন শিউলি প্রসঙ্গ কোন না কোন ভাবেই একদিন এসে পড়বে। নিজেকে একান্ত প্রচ্ছন্নে রেখে অবনীর হাতে মেয়ের সব দায়দায়িত্ব সঁপে দিয়েছে। পেশায় সে বেশ্যা। তার দেহ অর্জিত অর্থে অহনা বড় হচ্ছে। অথচ অহনা তার কেউ না। মাতৃত্ব কী একেই বলে? আর তিনি নিজেও তো তাই করে যাচ্ছেন। তাঁর পরিচয়েই অহনা বড় হয়েছে। লেখাপড়া শিখছে। তার বিয়ের জন্যে চিন্তিত হয়েছেন। আসলে, অবনীমোহন ভাবেন, তিনি আর শিউলি কেবল নিজেদের ধর্ম পালন করে চলেছেন। কিন্তু অহনা যেদিন জানবে, অবনী তার কেউ নয়, এক অবিমৃষ্যকারী পিতামাতার পরিত্যক্ত সন্তান সে। কে তার বাবা কে তার মা একমাত্র শম্ভু দালাল ছাড়া আর কেউ জানে না। শিউলিও না।

—মেশোমশাই, আবার আপনি ভাবতে শুরু করলেন? ওর মাসীর ঠিকানাটা পেলে আমরাই নয় তাঁর খোঁজ নিয়ে নিতাম।

হঠাৎ অবনীকে বেশ শক্ত হয়ে উঠতে দেখা গিয়েছিল। অনমনীয় শব্দে উচ্চারণ করেছিলেন, আমি জানিনা সে কোথায় থাকে।

সে রাতের পর প্রায় দিন পনেরো মতো অহনার সঙ্গে আর সুমনের যোগাযোগ হয়নি। হঠাৎ একটা কল শো পেয়ে ওরা ধানবাদের দিকে গিয়েছিল পুরো দল নিয়ে। শো হয়েছিল একটাই। কিন্তু কলকাতা ফেরার তাৎক্ষণিক দায় কারোরই তেমন ছিল না। ফলে ঘোরাঘুরি আড্ডা এবং এক্‌স্‌কারসান করে ফিরেছিল দিন পনেরো পর। দাদা আগের মতোই। জমানো টাকায় সংসার চলছিল কায়ক্লেশে। আর বৌদির মুখে সব হারানোর হতাশা। মাঝে মাঝে সুমনের মনে হয় এভাবে দাদার বেঁচে থাকার কোন মানেই হয় না। দাদা মারা গেলে নাভিশ্বাস ওঠা সংসারটা একটু বাঁচার মুখ দেখতে পাবে। দাদার জায়গায় বৌদি কোন

চাকরি হয়তো পাবে না, কিন্তু কর্মরত অবস্থায় চলে গেলে থোক অনেক টাকা পাওয়া যাবে। দাদার নমিনেশনে হাফ হাফ ভাগ করে দেওয়া হয়েছে মা আর বৌদিকে। অর্থাৎ সে সব ফিক্সড্ করে দুজনের চলে যাবে। তখন নিজেরটা নিজেই ভাবার সুযোগ পাবে। কিন্তু এখন, দিনরাত ওষুধের খরচ আর মৃতকল্প এক অথর্ব মানুষকে টেনে হিঁচড়ে টিঁকিয়ে রাখার চেষ্টা চলছে।

সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরেছিল। বৌদির সঙ্গে ওর ভাবসাব ভালোই। সুমন জিজ্ঞেস করেছিল, দাদা কেমন?

বৌদির নির্বিকার উত্তর, এখনও আছেন। পরশু একবার রেসপিরেসন ফেল করেছিল কিছুক্ষণের জন্যে। তাড়াতাড়ি ডাক্তার এসে কী সব ওষুধ দিয়ে গেলেন। শুনিয়ে গেলেন একই কথা, ওকে টেনশন করতে বারণ করবেন? বললেই কী টেনশন কমে সুমন?

দুজনের প্রায় কাছাকাছি বয়েস হওয়ার জন্যে সুমনও ওর নাম ধরে ডাকে, তুমি কী একেবারেই ভেঙ্গে পড়লে সুনন্দা?

—না।

—আর শুনতে তোমার খারাপ লাগলেও বলতে পারি, আমি চাই না দাদা আর বেশীদিন বেঁচে থাকুন। এখনও উঠে কোন রকমে নিজে বাথরুমটা যেতে পারছেন কিন্তু এর পর, না না, হাজার কষ্ট হলেও নিষ্ঠুর সত্যটা, যেটা আমরা সবাই চাইছি, সেটা বলি না, এবং সেটাই আজ বলে ফেললাম। রাগ করো না সুনন্দা।

সুনন্দা ম্লান হাসে, তারপর বলে, জানি, কিন্তু ও চলে গেলে বড় ফাঁকা হয়ে যাব। এখনও তো মানুষটা দু একটা কথা বলছে। এখনও তো মানুষটাকে ছুঁতে পারছি। আমি তো বুঝতে পারি এত তাড়াতাড়ি সব ছেড়ে চলে যাবার সত্যিটা ও কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না। আমার সঙ্গে কথা বলতে গেলেই ওর দু চোখ জলে ভরে ওঠে।

সুমনের কিছু বলার ছিল না। মাথা নীচু করে ও চলে গিয়েছিল বাথরুমে। খাওয়া দাওয়া সেরে দ্বিপ্রাহরিক একটা ঘুম। ওদের শোয়ার ব্যবস্থাটা ঝুপড়িতে বাস করা মানুষের মতো। একটাই মাত্র মাঝারি মাপের ঘর। সেই ঘরে খাটের

ওপর দাদা আর সুনন্দা। খাটের নীচে মাটিতে সামান্য ফালি জায়গায় মা। আর তার জায়গা রান্নাঘরে। একদিকে রান্নার সরঞ্জাম। তারই মধ্যে ছোট্ট নেয়ারের খাটিয়া। সেখানেই তার বাদশাহী ঘুম। দাদা চাকরি থাকা অবস্থায় একটা ছোট টেবল ফ্যানের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এখন নিজেই ইচ্ছে করে বন্ধ রেখে দেয়। এত সি ই এস সি'র টাকা কে জোগাবে?

বিকেলেই ও গিয়েছিল অহনার সঙ্গে দেখা করতে। কারণ ছটার পরই ও টিউশানিতে বেরিয়ে যায়। আর সে চলে যায় রিহার্সালে। একটু চমকে গিয়েছিল অহনার ফ্ল্যাটের দিকে তাকিয়ে। জানালা দুটোই বন্ধ।

তবে কী? ইস, সুনন্দাকেও জিজ্ঞাসা করা হয়নি ওদের কথা। ওর বাবির কিছু হয়ে গেল নাকি? হলেও অহনার তো কোথাও যাবার জায়গা নেই। নাকি বাপ আর মেয়ে বেরিয়েছে কোথাও। নাকি, আর ভাবতে না পেরে ও গিয়ে সটান হাজির হয়েছিল অহনাদের ঘরের দরজার সামনে। না তালা দেওয়া ছিল না। বার দুয়েক কড়া নাড়ার পর ঘুম চোখে উঠে এসে দরজা খুলে এক অদ্ভূত নির্বাক দৃষ্টিতে সুমনের দিকে তাকিয়েছিল।

সুমনও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে গিয়েছিল, কিন্তু তার আগেই অত্যন্ত নিরাসক্ত আর উদাসীন গলায় অহনা বলেছিল, অবনীবাবু এখন বাড়ি নেই। পরে আসবেন।

—অবনীবাবু যে এখন বাড়ি থাকবেন না তা জানি। কিন্তু তাঁর মেয়েতো আছে, সুমনের গলায় হাল্কা রসিকতা।

—কী দরকার তার মেয়েকে ?

গনগনে আঁচের তাপ ছড়িয়ে যেতে থাকে অহনার রাগী প্রশ্নে। একটু ইতস্তত করে সুমন বলেছিল, কী হয়েছে অহনা? এত রাগ কেন ?

—বাজে কথা শোনার মত সময় এবং ধৈর্য আমার নেই। জরুরী কিছু কথা থাকলে বলুন, নইলে,

এবার সত্যিই থতমত খেয়েছিল সুমন। অহনা তার সঙ্গে ঠাট্টা করছে না সিরিয়াসলি বলছে সেটা ও বুঝে উঠতে পারছিল না। অবাক অবাক গলায় সে জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি এভাবে কথা বলছ

কেন অহনা ? এ রকম তো—,

—কোনটায় আপনার বিসদৃশ লাগল ?

—মাত্র কটা দিন কলকাতার বাইরে গিয়েছিলাম, তাতেই অবনীমোহন রায় হয়ে গেলেন অবনীবাবু, আমি একেবারে তুমি থেকে আপনি ? ইয়ার্কি হচ্ছে ?

ঘরে ঢুকতে দেবার বিন্দুবিসর্গ গরজ না দেখিয়ে দরজার মুখে দাঁড়িয়ে অহনা বলেছিল, কাউকেই তো আমি অসম্মান করে কথা বলিনি। আর ইয়ার্কি করার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

—সম্মানটা একটু বেশী বেশী দেখালেই সেটা অসম্মান বলে মনে হয়।

—তা হবে। আপনার আর কিছু বলার আছে ?

হঠাৎ সুমনের মেজাজ গরম হয়ে গিয়েছিল, জোর করে অহনাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ঘরে ঢুকতে চেয়েছিল। কিন্তু অহনার মুখ থেকে প্রবল 'না' শব্দে প্রথমটা হতচকিত পরে বিস্ময় নিয়ে কেবল ওর চোখের দিকে তাকিয়েছিল।

না, এ অহনা সে অহনা নয়। কোথায় সেই দুষ্টু দুষ্টু চোখের কোণে হাসি, টসটসে মুখে সামান্য লাজুক রক্তিমতা। তীব্র দৃষ্টিতে একবার সুমনের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, আপনি আমায় কী ভেবেছেন ? বাজারি মেয়ে ?

—আঃ অহনা। মাত্রা ছাড়ানো অশ্লীল কথাগুলো বোল না।

—যা সত্যি তাই বলছি। কী করতে আসেন এখানে ? বিনি পয়সায় স্ফূর্তি করতে ? স্ফূর্তি করতে গেলে পকেটে টাকা নিয়ে আসতে হয়। দাম না দিলে কিছুই পাওয়া যায় না। এখন থেকে পকেটে টাকা নিয়ে আসবেন। যা যা চাইবেন তাই পাবেন, যা করতে বলবেন তাই করব।

অন্য কেউ হলে নাটকীয় ভঙ্গীতে অহনার গালের ওপর চড় বসিয়ে দিত নির্ঘাৎ। কিন্তু, সুমন ঠাণ্ডা মাথার ছেলে। সে জানে এই মুহূর্তে কোন সীন তৈরী করা উচিত নয়। ধীরে ধীরে অহনার কাছে গিয়ে তাকে দুহাতে ধরে নিজের কাছে এনে কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু তার আগে অহনাই তৈরী করল নাটকীয় দৃশ্যটি। প্রচণ্ড ঝাপটায় থামিয়ে দেয় সুমনকে। ঘটনার

আকস্মিকতায় সুমন থমকে গিয়েছিল। সে ভেবেই উঠতে পারছিল না তার অপরাধটা কি ? তবু বলতে চেয়েছিল, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে অহনা ? সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অহনা প্রায় চিৎকার করে বলেছিল, আর কোনদিন যদি অহনার কাছে আসার চেষ্টা করেন তাহলে চিৎকার করে কমপ্লেক্সের সব লোককে জড়ো করে বলব, এই ছেলেটা এতদিন ধরে আমায় নোংরা করে দিয়েছে। এরপর আরো নোংরা করার ধান্দায় ঘুরছে। যান, এখুনি এ ঘর থেকে বেরিয়ে যান। আর কোনদিনও এ ঘরমুখে হবার চেষ্টা করবেন না।

রিহার্সাল রুম থেকে বেরিয়ে শিয়ালদা কোর্টের কাছে আসতে আসতে অহনার সেদিনের সব কথা মনে পড়ছিল। এর পরেও মান অভিমান ঝেড়ে ফেলে দুজনের সঙ্গেই ও দেখা করতে চেয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য এক নীরবতায় ওদের ফ্ল্যাট নির্জন দ্বীপে পড়ে থাকা একটা পোড়ো বাড়ির মতোই মনে হত। অবনীবাবুই বা কোথায় গেলেন কে জানে ?

তারপর দেখতে দেখতে ছটা মাস কেটে গেছে। দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়ে নাটকের রিহার্স করেছে। বারে বারে অন্যমনস্ক হয়েছে একটি অনিবার্য প্রশ্নের উত্তর প্রত্যাশায়। তারপর একসময় সব অনুরাগ ক্রমশ বিরাগে টার্ণ করেছে। বারবার সুমনের মনে হয়েছে অহনা কী প্রতারক ? নির্মম অহংকারী ? একমাত্র বেকারত্ব ছাড়া সে আর কিসে কম, অহনার থেকে ?

ভোলেনি অহনাকে। ভোলা যায়ও না। কিন্তু ভোলার আপ্রাণ চেষ্টায় নিজেকে আরো বেশী করে নাটকের দলে মিশিয়ে দিয়েছে।

বাসটা এসে গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎই মনে পড়ে গেল আজ কস্তুরী সান্যালকে ফোন করে তার হ্যাঁ বা না জানানোর কথা।

বাসটা ছেড়ে দিয়ে ও এস টি ডি বুথে চলে গেল। ইলেকট্রনিকসের দৌলতে এখন একবারেই ফোন বাজে। ওপাশ থেকে মিষ্টি সুরেলা গলা কথা বলে উঠল, হ্যালো, কে বলছেন ?

—সুমন বলছি। আমি রাজী আছি।

—বেশ। আমি কাল যাচ্ছি না। তুমি পরশু সকাল দশটার মধ্যে চলে আসবে।

—হ্যাঁ, নিশ্চই।

চার

স্টেজ অ্যাকটিং-এর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও সুমনের বুকটা দুরদুর করছিল। প্রথমে ভেবেছিল ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানো কী আর এমন কাজ! কিন্তু কস্তুরী যখন ওকে নিয়ে গিয়ে ডিরেক্টরের সামনে দাঁড় করিয়ে বললেন, রণেশ, হিয়ার ইজ মাই নিউ ফাইন্ডিং। আমার মনে হয় স্ক্রীন টেস্টের দরকার হবে না। তবু তুমি ভাল করে দেখে নাও। অ্যাকটিংটা ও খুব ভালোই করে। কিন্তু সোহিনীর সঙ্গে কতটা ম্যাচিং হয় সেটারও কয়েকটা কমপোজিট শট্ নিয়ে দেখে নাও।

—কিন্তু ম্যাডাম, রণেশ সুমনের আগাপাশতলা জরিপ করতে করতে দোনামোনা করে বলে, নিউ মডেল। সোহিনী যা নাক উঁচু মেয়ে। ক্লোজ আপ অ্যান্ড ইনটিমেট শট্গুলো কী ফ্রি হয়ে করতে চাইবে?

তীর্যক দৃষ্টিতে ঘুরে তাকান কস্তুরী। তারপর আলতো করে চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন, দিস ইজ মাই চয়েস। সোহিনীর যদি মনপসন্দ না হয় দেন উই সুড ফাইন্ড আউট আদার গার্ল। কোম্পানির লাভ লোকসানের দিকগুলো আমাকেই দেখতে হবে। ইফ সী ডিনাইজ লেট হার গো।

—কিন্তু ম্যাডাম, সোহিনীর এ লাইনে অভিজ্ঞতা অনেক। একবার টেকিং-এ শট ও-কে করে দেয়। দুম করে ওকে না বলাটা কী, একটু ভেবে দেখুন।

—আমি ভেবে দেখেছি। নান্ ইজ ইনডিসপেনসেব্ল ইন দিস ওয়ার্ল্ড। সোহিনী গেলে মোহিনী আসবে। তাছাড়া, রণেশ, আরো একটা দিক ভেবে দেখো। বিজ্ঞাপনে ক্রমাগত একই মুখের ব্যবহারে বিজ্ঞাপনটাও জোলো হয়ে যায়। কনফিউজিংও বটে। ধরো স্ট্রে কেউ টিভি নব ঘুরিয়েছে, দেখতে পেল একটা পুরনো মুখ, যে মেয়েটা সাবানেও আছে, শাড়ির বিজ্ঞাপনেও আছে আবার মাখনের বিজ্ঞাপনেও আছে। ভিউয়ার ঝট্ করে অন্য চ্যানেলে চলে যাবে অন্য কোন প্রোগ্রামের জন্যে। অর্থাৎ এত টাকার বিজ্ঞাপনটা মাঠে মারা গেল। ডু ইউ ডিনাই?

—ম্যাডাম, আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করছি না, তবে বিজ্ঞাপন জগতে সোহিনীর একটা ক্রেজ আছে। পুরনো মুখ

হলেও, আমি খোঁজ নিয়েছি, স্ক্রীনে ওর মুখটা ভেসে উঠলেই ভিউয়ার কিছু একটা রোম্যাণ্টিক প্রত্যাশায় থাকে।

—অস্বীকার করছি না। তাই ইচ্ছে থাকলেও ফিমেল মডেল চেঞ্জ করিনি। এনিওয়ে ইউ আস্ক্ সোহিনী। ওকে বলবে সুমন সেন ইজ আওয়ার নিউ মেল ফিগার। ওর সঙ্গেই কাজ করতে হবে। দেখই না ও কী রিঅ্যাকট্ করে। সুমনের মতো হ্যাণ্ডসাম ইয়াং ম্যানকে তো ওরও পছন্দ হয়ে যেতে পারে। রণেশ, ডোণ্ট গেট নারভাস। ওক্কে, লেট হার মীট মী। ততক্ষণে তুমি সুমনের স্ক্রীন টেস্টটা নিয়ে নাও। সুমন, আর ইউ রেডি?

কস্তুরীর চাওয়া এবং নিজের মতে স্থির থাকার দৃঢ়তা দেখে ওর মধ্যেও একটা জেদ চেপে যাচ্ছিল। বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য না দেখিয়ে সুমন বলে, ইয়েস ম্যাডাম। এখন আমায় কী করতে হবে বলুন।

ডিরেক্টর রণেশ মজুমদার সরাসরি সুমনের কাছে চলে আসে, হাত বাড়িয়ে শেকহ্যাণ্ড করতে করতে বলে, ওয়েলকাম ইয়াং ম্যান। আপনাকে একবার মেকআপ রুমে যেতে হবে। সাঁতার জানেন তো?

সুমন মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানায়।

—ওয়েল। এটা একটা সফ্ট ড্রিঙ্ক্সের বিজ্ঞাপন। আপনি সাঁতার কেটে জল থেকে উঠে আসবেন। একটি সুন্দরী তরুণী আপনি জল থেকে উঠলেই, আপনার হাতে রঙীন গ্লাসটা এগিয়ে দেবে। আপনি সেটা অ্যাকসেপ্ট করবেন। তারপর র‍্যালিস করে একটি চুমুক দেবেন। মুখে ফুটিয়ে তুলতে হবে, ঐ এক চুমুকই আপনার মুখের সব ক্লান্তি সরিয়ে দিয়েছে। এরপর মেয়েটি পিছন থেকে আপনাকে জড়িয়ে ধরে আপনার পিঠে গাল ঠেকিয়ে বলবে. দিস ইজ 'স্পোর্টস্ম্যান্স্ প্রেফারেন্স'। এনার্জি স্টিমুলেটিং ফ্রুট জুস্। মাই চয়েস। ছেলেটি আর একটা চুমুক দিয়ে বলবে, ইয়েস ডার্লিং, অলসো মাই চয়েস। ডু ইউ ফলো মী?

—ইয়েস। সংক্ষিপ্ত জবাব সুমনের।

—ওয়েল, আপনার কয়েকটা ছবি একটু দেখে নিই মিনিয়েচারে।

—কিন্তু আপনার ফিমেল মডেল?

—খেঁদিপদি যেই হোকনা, আপনার কোন প্রেজুডিস আছে নাকি ?

—নো, নট অ্যাট অল।

—তাহলে চলুন।

জামাকাপড় ছাড়িয়ে, খালি গায়ে, কেবলমাত্র সুইমিং কস্টিউম পরিয়ে অন অ্যাকশান সুমনের বেশ কয়েকটা মিডলং, ক্লোজাপ নেওয়া হয়ে গেল। মনিটরে ছবি দারুন এসেছে। ডাইরেক্টর ওকে করতেই ক্যামেরা ম্যান সন্দীপ এগিয়ে এসে একবার মনিটরটা দেখে নিয়ে বলল, দাদা, ভদ্রলোকের ফিগারটা সত্যিই দারুণ। আর ক্লোজাপগুলোতে, আপনিও দেখলেন, খুব ভালো হবে দাদা, যদি ভদ্রলোক সোহিনীর সঙ্গে কমপোজিট শর্টে নারভাস না হয়ে পড়েন।

—হবে না। সুমনবাবু স্টেজ থেকে এসেছেন। দেখুন তো আপনার সোহিনী দেবী এলেন কি না। শুটিংটা আজই শেষ করতে হবে। খুবই আর্জেন্ট।

প্রোডাকশান ম্যানেজার বলাইবাবু তড়িঘড়ি ছুটলেন। বেশি দূর যেতে হল না। ছোট্ট মারুতি সেলফ্ ড্রাইভ করে সোহিনী স্টুডিওতে পেঁাছে গেছেন।

বলাইবাবু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তারপর দরজা খুলে বললেন, এতো দেরী করলেন ম্যাডাম! রণেশ বাবুতো ছটফট করছেন। যান তাড়াতাড়ি মেকাপ নিয়ে নিন।

ভ্রুটা একটু বাঁকিয়ে সোহিনী বলে, মেল মডেল পাওয়া গেছে ?

—গেছে। এককথায় দারুণ।

—নাম কি ?

—চিনবেন না। একদম আনকোরা। ম্যাডামের কালেকশান।

হুঁ, বলে আর না দাঁড়িয়ে সোহিনী সোজা শ্যুটিং জোনের দিকে এগুতে থাকে।

—ম্যাডাম, মেকাপটা নিয়ে নিলে পারতেন। আপনার তো স্ক্রীপ্ট্ শোনাই আছে।

সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে সোহিনী জিজ্ঞাসা করে, রণেশবাবু কোথায় ?

—স্পটেই আছেন।

—ঠিক আছে, বলে সোহিনী এগিয়ে যায়।

বলাইবাবু একরাশ বিরক্তি নিয়ে বিড়বিড় করেন, শালী, তোমার ল্যাঙ খাওয়ার দিন এসে গেছে। ম্যাডাম এবার নতুন মুখের দিকে ঝুঁকেছেন। তখন বুঝবি ডাঁট দেখানোর মজা।

শুটিং স্পটে সোহিনীকে মেকাপ ছাড়া আসতে দেখেই রণেশ প্রায় খেঁকিয়ে ওঠেন। তিনি মুখ পাতলা লোক। বলে উঠলেন, এমনিতে তো এলে লেট করে, এখন ঢংয়িয়ে এখানে চলে এলে কেন? একেবারে মেকাপটা করেই আসতে পারতে তো!

—হিরোকে দেখতে এলাম।

—হিরোকে বাদ দিয়ে তো শ্যুটিং হবে না। তখন দেখলে কী দেখাটা কমে যেতো। যতঃ সব ন্যাকামি, এসব তোমাদের পক্ষেই সম্ভব।

—কিন্তু যার সঙ্গে কাজ করতে হবে তাকে একবার দেখে নিলে হোত না?

—তুমি তো দেখছি বলিউডের এক নম্বর হিরোইন হয়ে গেছ। মনপসন্দ নায়ক না হলে তার সঙ্গে কাজ করবে না।

—আপনি আমার কথাটা ধরতে পারছেন না রণেশদা। যার সঙ্গে কাজটা করতে হবে তার সম্বন্ধে মিনিমাম একটা আইডিয়া থাকা দরকার। একটা আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং। নইলে ফ্রি-লি কাজ করা যায়?

—বড় পর্দা ছোট পর্দা আর অ্যাড ফিল্মে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছ তাও ন্যাকাপনার আর শেষ নেই।

পাশেই আর্শাদ বলে একজন প্রোডাকশন বয় দাঁড়িয়েছিল। রণেশ মজুমদার তাকে দিয়ে ডাকিয়ে আনলেন সুমনকে। সুমনের তখন মেকাপ শেষ হয়ে গেছে। মেকাপ বলতে খালি গায়ে সুইমিং কস্টটিউম পরা। গাটা চকচকে দেখাবার জন্যে সামান্য অলিভ অয়েল মাখানো হয়েছে। ও কেবল তার ওপর একটা ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে এসেছে। সুমন আসতেই রণেশ মজুমদার ওর সঙ্গে সোহিনীর আলাপ করিয়ে দিলেন, সোহিনী, এই ভদ্রলোকই তোমার বিপরীতে আছেন। সুমন সেন। আর ইনি সোহিনী খেমকা। নাও, কি আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং করবে করে নিয়ে তাড়াতাড়ি সাজুগুজু করে এসো। একটু লাউড মেকাপ নেবে। জিনস

আর ইয়ালো শার্ট। ঠিক আধঘণ্টা পরই আমি শ্যুটিং আরম্ভ করব, বলেই হন্‌হন্‌ করে রণেশ ওদিকের কাজ দেখতে চলে গেলেন।

সুমন এতক্ষণ সোহিনীকে দেখছিল। বছর তেইশ-চব্বিশের মধ্যেই হবে বয়েসটা। কিন্তু সারা শরীরে যৌন আবেদন প্রকট। সেটা আরো ফুটে উঠেছে পোষাকের দৌলতে। গায়ের রংটা খুব ব্রাইট বলে পাতলা ডার্ক ব্লু শাড়িতে আরো বেশি সেকস্‌ অ্যাপিল বেড়ে গেছে।

—হ্যালো, বলে হাতটা এগিয়ে দেয় সোহিনী। মনে মনে সেও সুমনের ফিগারের তারিফ না করে পারলো না। মুখটাতো রীতিমত রোম্যাণ্টিক। মনে মনে ভাবলো ফিল্‌মে গেলে ছেলেটা নাম করতে পারতো।

সোহিনীর এগিয়ে ধরা হাতটায় একবার হাত ঠেকিয়ে সুমন বলে, আপনাকে এর আগে টিভির পর্দায় দেখেছি।

— থ্যাংকু। আপনার কী এই প্রথম ?

— হ্যাঁ।

—নার্ভাস লাগছে ?

—না, একেবারেই নয়।

—বলেন কী ? প্রথম দিন ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে প্রায় সবারই একটু আধটু নার্ভ ফেল করে।

— আমার তেমন কিছুই মনে হচ্ছে না।

—ভেরি গুড। আপনি সিরিয়ালে বা ছবিতে চেষ্টা করেন না কেন ? আজকালতো ভালো হিরোই নেই।

—আমি নাটক করি। স্টেজটাকেই আমার বেশি পছন্দ।

—স্টেজের সঙ্গে কিন্তু ফিল্‌মের কোন বিরোধ নেই।

—না তা নেই, তবে সেইভাবে ভাবিনি কিছু। আসলে মিসেস সান্যাল আই মীন কস্তুরী দেবী প্রোপোজালটা দিলেন। আমিও হ্যাঁ বলে দিলাম।

—ভালোই করেছেন। ম্যাডামের চয়েজ খুব একটা ভুল হয় না। ওক্কে, পরে ভালো করে আলাপ হবে। আপাতত রেডি হয়ে নিই। রণেশ মজুমদার যদি দেখে এখনও কথা বলে যাচ্ছি তাহলেই খিস্তির ঝড় বইয়ে দেবেন।

সোহিনীর থেকে সুমনের শর্টই বেশি। জলে ঝাঁপ দেওয়া। কয়েকবার সামনে থেকে টেক্। কযেকটা ব্যাক থেকে নেওয়া। তারপর জল ছেড়ে ওঠা। এগুলোয় কোন অসুবিধা হয়নি। জল থেকে ওঠার পর ঠিক যে মুহূর্তে সোহিনী এসে তাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরবে তখনি তার গাটা শিরশির করে উঠেছিল। এর আগে তার নগ্নদেহে কোন মেয়ে একমাত্র অহনা ছাড়া আর প্রেমাপ্লুত হয়ে জড়িয়ে ধরেনি। দৈহিক সম্পর্ক যেটুকু হয়েছিল সেটা অহনার সঙ্গেই। বেশির ভাগই একটু চুমু কী একটু আবেগে জড়িয়ে ধরা। মাত্র একদিনই অবনীমোহনের অনুপস্থিতে ব্যাপারটা অনেকটাই গড়িয়ে গিয়েছিল। তাই নিয়ে দুজনেরই দুঃশ্চিন্তার শেষ ছিল না। শেষকালে দুঃশ্চিন্তা কাটবার পর অহনা বলেছিল বিয়ের আগে আর কোনদিনও যেন এসব মাথায় না আসে। আসেও নি। সুমনও তা চায়নি। কিন্তু,

পরপর তিনটে শট্ই এন জি হয়ে গেল। সোহিনী তার জলসিক্ত শরীরটা এমনভাবে আঁকড়ে ধরছিল যেন সত্যিই তারা প্রেমিক প্রেমিকা। আসলে সত্যিকার প্রেমিক হলে বা বেশ কিছুদিনের পরিচয় থাকলে ব্যাপারটা একটা শটেই ও-কে হয়ে যেতো। কস্তুরী দূর থেকে শট টেকিংটা দেখছিলেন। তিনবারের পর এগিয়ে এসে বললেন, সুমন, ডোণ্ট গেট নারভাস। স্টেজ হলে কী করতে? ফাম্বল করতে? কখনোই নয়। তাহলে? হোয়াই য়ু আর বিকামিং শ্যোকি? ক্যামেরা অর সোহিনী? ইফ্ সোহিনী ইজ দ্যা ফ্যাক্টর, সোহিনী প্লীজ হেল্প্ হিম। হি ইজ টোট্যালি নিউ পার্সন ইন দিস সিচ্যুয়েশন।

কস্তুরীকে থামিয়ে দিযে সোহিনী বলল, অলরাইট দিদি, আপনি শর্ট নিন। এবার দেখবেন ঠিক ও-কে হয়ে গেছে।

থ্যাঙ্কু, বলে কস্তুরী ফিরে গেলেন। সোহিনী চলে গেল ক্যামেরা ম্যানের কাছে। কিছু কথাবার্তা বলে নিল। রিটেকিং-এর আগে সোহিনী সুমনের একেবারে সামনে এসে দাঁড়া বলে, কারো সঙ্গে এর আগে প্রেম করেননি?

—না।

—বিশ্বাস হয় না। ঠিক আছে আমার চোখের দিকে তাকান।

সুমন তাকায়। সোহিনী বলে, আমাকে কী দেখতে খারাপ ?

—এ কথা কেন ?

—আলাপ নয় কয়েক ঘণ্টার। কিন্তু প্রেম এক মিনিটেই হয়। সেই এক মিনিটের প্রেমের অভিনয়টাই তো আপনাকে করতে হচ্ছে। তারওপর আপনি স্টেজ অ্যাক্টর। কাম অন ফ্রেণ্ড। ডোণ্ট গেট নারভাস। আইল হেল্প য়ু।

আত্মশ্লাঘায় ঘা লাগে সুমনের। এখন এই মেয়েটার কাছে তাকে অভিনয়ের জড়তা কাটানো শিখতে হবে ? এতোদিন সে শিখিয়ে এসেছে। সোহিনীর চোখ তখনও তার চোখের উপর ছিল। আরো তীব্র আর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ছড়িয়ে সুমন মনে মনে বলল, চলো সুন্দরী, দেখি তোমার কেরামতির দৌড়। হাত তুলে একবার রণেশকে জানিয়ে দিল শর্ট টেক করতে।

আবার জল ঠেলে ওঠার দৃশ্য। সোহিনীর এগিয়ে আসা। স্পোর্টসম্যানস্ প্রেফারেন্সের বোতল থেকে জুস ঢালা। গ্লাস এগিয়ে দেওয়া। দুজনের দুটো ডায়লগ। সুমনের চুমুক দিয়ে ক্লান্তি অপোনোদনের ইমপ্রেশান নিখুঁত ভঙ্গীমায় তুলে ধরা, এরপর সোহিনী, কখন যেন তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, অদ্ভুত কোমল হাতে শরীর বিবশ করা আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধীরে ধীরে তার পিঠে গাল ঠেকিয়ে অস্ফুটে ডায়লগ বলেছে, এবং সে নিজেও তার পরবর্তি ডায়লগ টেপের বুকে ঢুকিয়ে দিয়েছে সেটা যখন উপলব্ধি করল তখন রণেশের গলা থেকে কাট্, ফাইন, শব্দগুলো বেরিয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে কখন যেন কস্তুরী এগিয়ে এসেছেন, সুমন, এমনিতেই জলে অনেকক্ষণ ঝাঁপাঝাঁপি হয়েছে। যাও ড্রেস চেঞ্জ করে আমার অফিসে চলে এসো। আই উইল বী দেয়ার ফর ইউ। সোহিনী, তুমিও চলে এসো। পেমেণ্ট রেডি আছে !

—আজকেই পেমেণ্ট দিয়ে দেবেন ?

—আমি ফেলে রাখতে ভালবাসিনা। যদি কোন কারণে এ্যাড্টা অ্যাপ্রুভ্ না হয় তখন আমার গেঁতোমি আসবে তোমার পেমেণ্ট দিতে। আমার বিজনেশ মেণ্টালিটি সম্পূর্ণ আলাদা।

কস্তুরী আর দাঁড়ালেন না। সুমন ওর চলে যাওয়াটা দেখছিল। কে বলবে মহিলার প্রায় চল্লিশের কাছে বয়েস।

এককালে দু'একটা সিনেমা করেছেন। যে কোন কারণেই হোক লাইনটা স্যুট করেনি। কিন্তু গ্ল্যামার এখনও টসকায়নি। তারপর পার্সোন্যালিটি, একজন মহিলার পক্ষে অঢেল।

—দিদি এখনও খুব চটকদার। ঐ বয়েসে আমরা হারিয়ে যাব।

—আমিও শুনেছিলাম আপনি খুব নাক উঁচু। যার তার সঙ্গে অ্যাড্ করেন না।

—আজ সারাদিনে কী তাই মনে হল?

—কি জানি, মেয়েদের আমি ঠিক চিনতে পারিনা।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই সুমন চলে গেল ড্রেসিং রুমের দিকে। সোহিনীর ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল তেরচা এক ফালি হাসি।

—তোমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট আছে?

—খেতে পায়না শংকরা জিজ্ঞেস করছেন হাতি রাখবার জায়গা আছে তো? না, আমার কোন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট ফ্যাকাউণ্ট নেই।

—ওয়েল, আজ তোমাকে ক্যাশই দিচ্ছি। নিয়ম ভেঙ্গেই। ঐ টাকার কিছু দিয়ে কালই একটা অ্যাকাউণ্ট খুলবে। যদি কোন অসুবিধা হয় আমাকে ফোন করবে। নাও, এই ভাউচারটায় সই করে দাও।

ভাউচারে টাকার অঙ্ক দেখে সুমনের চক্ষু স্থির। দু হাজার। ও ভাবতেই পারেনি একটু সাঁতার কেটে আর একটি সুন্দরী যুবতী শরীরের স্পর্শ অনুভব করলে দু হাজার টাকা সে পেতে পারে। কিন্তু মুখে সেটা না ফুটিয়ে ও নির্বিকার সই করে দেয়। পাশেই ক্যাশিয়ারবাবু ছিলেন। তিনি খামটা ধরিয়ে দিতে দিতে বললেন, গুনে নিন স্যার।

জীবনের প্রথম রোজগার। সারাদিন খাটনীর কামাই। যদিও স্টেজের জন্যে এর থেকেও অনেক বেশি ঘাম ঝরাতে হয়েছে, এবং বিনিময়ে কখনো সখনো ফেরার বাসভাড়াটা পেয়েছে। বেশ রোমাঞ্চ লাগছিল সুমনের।

—কি ভাবছ? কস্তুরী জিজ্ঞাসা করেন।

—না কিছু নয়।

—আরো বেশ কয়েকটা অ্যাডের কাজ আছে। তোমার ঠিকানাটা প্রোডাকশান ম্যানেজার বলাইবাবুকে দিয়ে যেও। কোম্পানির গাড়িতে ফিরবে নাকি বাসেই যাবে?

—বাসই ভালো।

সুমন খামটা পকেটে চালান করে বেরিয়ে আসে। সোহিনীর কথা মনে পড়ল। তাকে তো দেখা গেলনা। নাকি আগেই পেমেণ্ট নিয়ে চলে গেছে? তবে মেয়েটা তাকে আজ খুব হেল্প করেছে। যেভাবে নরম ছোঁয়ায় তার প্রশস্ত বুকে হাত বোলাচ্ছিল কে বলবে মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে তার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছে। রণেশবাবু ঠিকই বলেছিলেন, সোহিনী একেবারে প্রফেশনাল। শর্ট বুঝে নিতে ওর বেশি সময় লাগে না।

শ্যুটিংটা হচ্ছিল বালিগঞ্জের একটা পুকুর সমেত সাজানো বাগান বাড়িতে। পুকুরটাকে বিশেষ নজর দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। হয়তো শুটিং পরিপাসেই এত কায়দাকানুন!

ও হাঁটতে হাঁটতে চলে এলো বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডের মুখে। এখান থেকে যে কোন বাসে শিয়ালদা তারপর,

—কোথায়, কোনদিকে?

একটা মারুতি এসে দাঁড়িয়েছে ঠিক তার সামনেই। ভুত দেখা অবিশ্বাসী চোখে সুমন গাড়ির দিকে চোখ রাখতেই দেখে সোহিনী গাড়ির চালকের আসনে।

সুমন এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, সে কি, আপনি এখনও যাননি? আমার আগেই তো বেরিয়ে গেছেন?

—হ্যাঁ, এদিকে আর একটা অ্যাডের শ্যুটিং ডেটটা নিতে এসেছিলাম। যাবেন কোনদিকে?

—শিয়ালদা।

—তারপর কী ট্রেন না বাস?

—আমি যাব বেলেঘাটা সি আই টি বিল্ডিং।

—উঠে পড়ুন। আমি যাব শ্রীভূমি। আপনাকে ভি.আই পি বেলেঘাটা ক্রশিং-এ নামিয়ে দোব।

—আমি কিন্তু চলে যেতে পারব।

—আপনি যে নাবালক নন তা আমি জানি। আমার সঙ্গে দেখা না হলে আপনি ঠিকই বাড়ি পেঁাছে যেতেন। আর

আপনাকে লিফ্‌ট্ দিলে আমার ডিজেল বেশী খরচ হবে না। উঠে পড়ুন। সিলি লজ্জাগুলো আপনার মতো স্মার্ট ছেলেদের শোভা পায় না।

এরপর আর আপত্তির কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে না। সুমন সামনের সীটে গিয়ে বসে।

বেকবাগানের মুখে আসার আগেই সুমন জিজ্ঞাসা করে, আপনি তো বেশ ভালো গাড়ি চালান। আপনার গাড়ি ?

সামনের দিকে দৃষ্টি রেখে সোহিনী ভাবলেশহীন মুখে বলে, না। ভাড়াগাড়ি। রোজ একশো পঁচিশ টাকা।

— তাহলে বাসে যাওয়াই তো ভালো।

—আজ সকালে আপনি একটা কথা বলেছিলেন, আমাকে এর আগে টিভিতে দেখেছেন। শুধু টিভি নয়, ছবি দেখার অভ্যেস থাকলে সেখানেও দেখতে পেতেন। আপনার মতো আরো কয়েক হাজার লোক আমার মুখটা চেনে। বাসে গেলে ব্যাপারটা কী শোভনীয় ? বা সুখকর হবে ? এ লাইনে একটু ঠাঁট বাঁট এর দরকার।

—একটা কথা জিজ্ঞাসা না করে পারছি না সোহিনী দেবী। যদিও ব্যক্তিগত। তবু সামান্য কৌতুহল। আপনার পদবী দেখলাম খেম্‌কা। কিন্তু আপনি তো দারুণ সুন্দর বাংলা বলেন। অ্যাকসেণ্টে কোথাও কোন গণ্ডগোল নেই।

সুন্দর মুখে হাল্কা হাসি ফুটিয়ে সোহিনী বলে, আমি তো বাঙালিই ?

—তাহলে ঐ পদবী ? বিয়ে যে করেছেন তেমন কোন প্রমানও পাচ্ছি না। অবশ্য কোথায় টিক মেরে রেখেছেন সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

— মেয়েরা সিঁদুর পড়ে বিশেষ একটা সংস্কারে। স্বামীর মঙ্গল কামনায়। অথবা মডার্ন মেয়েরা নিজেদের নিরাপত্তার জন্যে। ও দুটোর কোনটাই আমার নেই।

— দ্বিতীয় কারণটা ছেড়ে দিলাম। কিন্তু প্রথমটা ? মিঃ খেমকা কি আপনার স্বামী নন ?

মারুতি প্রায় প্রাচীর কাছে এসে গিয়েছিল। আজ রাস্তায় তত জ্যামজট নেই। স্টিয়ারিং এ হাত রেখে সোহিনী জিজ্ঞাসা করে,

আপনাকে কোথায় নামালে সুবিধা হবে ?

—বুঝলাম, সুমন একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলে, আপনি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চান না বলেই এখানে নামাতে চাইছেন।

—ইউ আর ইনটেলিজেন্ট।

—বেশ, ও প্রশ্ন আমার করার অধিকারও নেই। আমার এখানে নামলেও চলে। তবে আজ আমাদের গ্রুপের দিন নয়।

—ঠিক আছে, বলেই গতি শ্লথ হয়ে আসা গাড়ির গতি আবার বাড়িয়ে দেয়। ঠিক ভি আই পি ক্রসিং এসে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বলে, অন্য অ্যাডএজেন্সীতে কাজ করবেন ? ওরাও একটা সুন্দর ছেলে চাইছে। আপনার কথা বলেছি তবে আপনাকে না জিজ্ঞাসা করে তো ফাইন্যাল কিছু বলা যায় না।

গাড়ি থেকে নামতে নামতে সুমন বলে, এই মুহূর্তে কস্তুরী দেবীকে জিজ্ঞাসা না করে আমি কিছুই বলতে পারছি না।

—ওয়েল, আবার দেখা হবে।

নিমেষে স্পীড নিয়ে সোহিনী তাকে ঘিরে একটা প্রশ্ন তৈরী করে উধাও হয়ে যায়।

সুমন যখন বাড়ি ফিরল রাত খুব বেশী হয়নি। মাত্র দশটা। অনেক দিনের অভ্যাস মতো অহনার ফ্ল্যাটের সামনে দিয়ে যাবার সময় একবার জানলার দিকে তাকালো। জানলা বন্ধ। মাঝে মাঝে সুমনের ভীষণ আশ্চর্য লাগে অহনার সেদিনের ব্যবহারের কথা ভেবে। অনেকবার একান্তে এ নিয়ে ভেবেওছে। কিন্তু হঠাৎ এই ঘটনার অর্থ আজও পরিস্কৃত নয়। একবার ভেবেছিল অবনীমোহনের সঙ্গে দেখা করে কারণটা খতিয়ে দেখবে। কিন্তু ভয়ংকর রকমের অপমানবোধ ওর পা দুটোকে যেন লোহার পেরেক দিয়ে আটকে রেখে দিয়েছে। ইচ্ছে থাকলেও ইচ্ছেটা আর রূপান্তরিত করতে পারেনি। প্রতিবারই ভেবেছ কিসের এত অহংকার ? কিসের এত দেমাক ? সে তো কোন অন্যায় করেনি। তাহলে কেন এই অপমানের ঘটনা ?

সুমন দাঁড়ায়নি। ভাবতে ভাবতেই ও কখন যেন ওর ফ্ল্যাটের দরজায় পোঁছে গেছিল। টোকা দিতেই সুনন্দা এসে দরজা খুলে দিল। সুমনকে দেখেই সুনন্দার মুখের থমথমে ভাবটা সরে

গেল। বেশ আগ্রহ নিয়েই ও জিজ্ঞেস করল, কী হল? কাজটা হয়েছে?

ভ্রূ নাচিয়ে সুমন বলে, তোমার কী মনে হয় আমি ধ্যারানো মাল?

—আহা কী কথার ছিরি। আমি কী তাই বলেছি। বলছি কাজটা হয়েছে তো!

সুমন একবার বড় বড় চোখে সুনন্দার দিকে তাকিয়ে ইসারায় কাছে ডাকল। সুনন্দা এগিয়ে যেতেই সুমন বলল, হাতটা পাতো তো।

—তোমার কাছে আমায় হাত পাততে হবে?

—তুমি না সব সময় গোলমেলে কথা বল। আমি কী সেই কথা বলেছি? একটা চমক দিতাম। ভালো, হাত পেতো না।

সুমন কৃত্রিম রাগে পাশের ঘর অর্থাৎ রান্নাঘর কাম নিজের খাটিয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। যাবার মুখে একবার থমকে দাঁড়াল। বিছানায় মৃতকল্প দাদা একই ভাবে শুয়ে আছে। সম্ভবত ঘুমুচ্ছে। হঠাৎ সুমনের খুব খারাপ লাগল। কতই বা বয়েস তার দাদার। তার থেকে বছর পাঁচ ছয়েকের মতো বড়ো। কিন্তু এরই মধ্যে বুক ঝাঁঝরা। কে জানে আর কদ্দিন! ঘুরে তাকালো সুনন্দার দিকে। ইশারায় জানতে চাইল দাদার অবস্থা কেমন! সুনন্দা এমন ভাবে ঘাড় নাড়লো যেটা বোঝায় তুমিও যেখানে আমিও সেখানে। আড় চোখে একবার তাকালো খাটের নীচে। মাদুর বিছিয়ে মা ননীবালা ঘুমচ্ছেন। এই দুটি মানুষের এই একটাই ছবি সে প্রতিদিন দেখতে পায়। এখন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। আর কিছু না বলে সুমন নিজের খাটিয়ায় গিয়ে বসে। শট্ দিতে গিয়ে তাকে আজ অনেকবার জলে ঝাঁপ দিতে হয়েছে। ঠাণ্ডা লাগতেও পারে নাও পারে। তবে পকেটের উষ্ণতায় তার ঠাণ্ডা লাগার সম্ভাবনাটা সম্ভবত নাকচ হয়ে যাবে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে সুমনের হঠাৎ মনে হল টাকার স্বাদটাই আলাদা। অন্যদিন রিহার্সাল দিয়ে ফেরার পর ও বেশ ক্লান্ত হয়ে থাকে। কিন্তু আজও তো সারাদিন একটা অন্যরকমের কাজে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু এখন একেবারেই ক্লান্তি আসছে না। সুমন

ভাবল, টাকার ওম্ শীতের লেপের থেকেও আরামদায়ক

চোখ বুজিয়ে তারিয়ে তারিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছিল। হঠাৎ এক তপ্ত স্পর্শে সে চমকে উঠল। চোখ খুলতেই দেখল সুনন্দা চায়ের কাপ হাতে একেবারে সামনে। ছ্যাঁকাটা ঐ দিয়েছে।

কাপটা নিতে নিতে সুমন বলল, ওহ্! কত দরদ ঠাকুরপোর ওপর।

—ওসব প্যানপ্যানানিতে ভুলছি না, হাতটা পেতে ওর প্রায় মুখের সামনে তুলে ধরে বলে, কি দেবে বলছিলে, দাও।

—দেখলে হাত পাততে হোল কিনা ?

—আমাকে তো তোমার কাছে সারাজীবনই হাত পাততে হবে সুমন।

—সুনন্দা, ফের তুমি এইসব আজে বাজে কথা বলছ ?

—যা সত্যি তাই বলছি। অপ্রিয় হলেও এটা সত্যি।

—না। এটা সত্যি হতে পারে না। গড্ ফরবিড্ দাদার যদি দুম করে কিছু একটা ঘটে যায় তুমি কী ভাবছ তুমি পথে বসে যাবে ? নাকি আমার দয়ায় বেঁচে থাকবে ?

—তাহলে কী করব ?

—দুম করে চাকরি হয়তো কোথাও পাবে না। তবে তুমি শিক্ষিতা মেয়ে। দাদার প্রফিডেণ্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুয়িটি, কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হলে পঞ্চাশ হাজার টাকার মতো ইনস্যুরেন্স ক্লেম। এ ছাড়াও দাদার ব্যক্তিগত পলিশিও আছে, তোমার ভাবনাটা কি সে ? দেখো বাপু তখন আমাকেই ল্যাঙ্ মেরে তাড়িয়ে দিও না যেন। আর আমার বুড়ি মা টাকে একটু দেখো।

—হুঁ, বেশ কপট গাম্ভির্য কণ্ঠে এনে সুনন্দা বলে, ঠিক আছে ভেবে দেখব। কাছাকাছি রাখা যায় কিনা।

—তবে !

—কী তবে ?

—আমি তোমার আর একটা বিয়ে দোব। কথাটা শুনতে খারাপ হলেও, বাস্তবটাও আমি ভেবে রেখেছি।

—আমি আবার বিয়ে করব এ কথা ভাবলে কী করে সুমন ?

—কারণ বয়েসটা তোমার খুবই অল্প। আমার থেকেও প্রায়

বছর দুয়েকের ছোট। তার ওপর যা সুন্দরী। দেখবে গুড়ের নাগরির গায়ে তখন মাছিরা এসে থিকথিক করছে।

—তা সেই সব উড়ো মাছিদের তুমি অ্যালাউ করবে কেন?

—আমি তোমার স্বাধীন ইচ্ছেয় বাধা দেবার কে?

হঠাৎ সুনন্দা চুপ করে যায়। হয়তো দশ সেকেণ্ডের মতো, তারপর ঘাড় বেঁকিয়ে বলে, কথাটা মনে রেখো কিন্তু সুমন সেন।

—কী?

—একটু আগে যা বললে।

—অনেক কথাই তো বলেছি। কোনটা ধরে তুমি নাড়ানাড়ি করতে চাইছ সেটাই বলো।

—নাহ্, আজ নয়। আজ সে কথা বড়ো ইমোশন্যাল হয়ে যাবে। পরে বলব, বলেই আবার হাত পাতে।

—ওহ্, ওটা ভোলবার নয়। চোখ বন্ধ কর।

—বেশ করলুম।

সুমন পকেট থেকে তার প্রথম রোজগারের পুরো টাকাটা সুনন্দার পাতা হাতে ফেলে দেয়। চোখ খুলেই স নন্দা অবাক, এতো টাকা?

—খুব বেশী নয়। দু'হাজার। আমার আজকের রোজগার।

—তার মানে তুমি এ রকম টাকা প্রায়ই রোজগার করবে?

—তা কী করে বলব?

—আর প্রতিবারই বাড়ি ফিরে এইভাবে আমার হাতে দিয়ে যাবে?

—সেই রকমই তো ইচ্ছে আছে। তুমি তো জানো, আমার খুব বেশী টাকার ডিমাণ্ড নেই।

—আমি বিশ্বাস করি না। প্রথম প্রথম তোমার দাদাও মাহিনের দিন বাড়ি ফিরে টাকার খামটা আমার হাতে তুলে দিত। তারপর পুরনো হতেই সব ও নিজের কাছে রেখে দিত।

—বোধহয় সবাই এক নয়। মা যদি সুস্থ এবং প্রকৃতিস্থ হতেন তাহলে মায়ের হাতেই দিতাম।

—আমি নিশ্চয়ই তোমার মা নই।

—মা ফার কথা হচ্ছে না। হচ্ছে বিশ্বাসের কথা। কারো

ব্যক্তিত্ব আর মাধুর্যের কাছে নিজেকে সমর্পণ করা। ওতে এক অন্য ধরণের তৃপ্তি আছে।

—নাটক করে করে তুমি ঘরে বাইরে সর্বদাই নাটক করে যাচ্ছ সুমন।

—এটা নাটক নয়। তাছাড়া যারা নাটক করে তারা সব সময় নাটক করতে চায় না।

—জানি এটা আবেগ। কিংবা তোমার দায়িত্ব পালন করার অনিচ্ছা।

—তুমি যা খুশী ভাবতে পার। তবে আমি বরাবরাই নিজের ইচ্ছের দামটা দিয়ে আসি।

—টাকাটা কী করব?

—সেটা তোমার ইচ্ছে।

—যদি তোমায় ঠকাই। ধরো মাঝেই মাঝেই তুমি এইরকম কিংবা এর থেকেও বেশী টাকা রোজগার করে আমার হাতে তুলে দিলে। মন না মতিভ্রম। যদি আমি কোনদিন অস্বীকার করি যে তুমি আমায় কোনদিনও কোন টাকা কড়ি দাওনি।

—সুমন সেনকে তুমি আজও চিনতে পারনি সুনন্দা। ছোট থেকেই সে দারিদ্রের সঙ্গে লড়ে গেছে। ভিক্ষে করে সে নাটক করে। কোনদিনও সে টাকাকড়িকে মানুষের থেকে বেশী মূল্যবান ভাবেনি। কী করবে সুনন্দা, সুমন সেনের সারা জীবনের রোজগারের টাকাও যদি তুমি নিয়ে নাও, সে কোনদিনও তোমায় প্রতারক বলবে না।

—নাহ্। আজ খুব খুশ্ মেজাজে আছো। তোমার নামে একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে।

—এইরে,

—কী হল?

—মনে পড়ে গেছে। মিসেস সান্যাল বারবার বলে দিয়েছেন এই টাকা থেকে একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট খুলতে। কারণ এর পর থেকে তারা অ্যাকাউণ্ট পেয়ি চেক দেবেন। সুনন্দা, তোমার কোন ব্যাঙ্কের সঙ্গে জানাশোনা আছে?

—আমার বাবাই তো ব্যাঙ্কের ম্যানেজার।

—কিন্তু আমার দাদাকে বিয়ে করেছিলে বলে তোমার বাবার

সঙ্গে তোমার দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ।

—না গো মশাই, আবার ভাব হয়ে গেছে। বাবা তো প্রায়ই আসেন তার জামাইকে দেখতে। উনি বাইপাস সার্জারির কথা বলছিলেন।

—কিন্তু সে তো বিশাল টাকার ব্যাপার।

—একমাত্র জামাইকে বাঁচাবার জন্যে তিনি এখন সব কিছু করতেই রাজী।

—যাক তোমার একটা হিল্লের রাস্তা দেখছি। বাইপাসটা কবে করাচ্ছো?

—হবে না? ডাক্তাররা বলে দিয়েছেন, এ রোগীকে টেবিলে তুলে ছুরি ছোঁয়ালেই শেষ।

আবার দাদার প্রসঙ্গ আসতে সুমনের মনটা খারাপ হয়ে গেল। সে যেন এখনও ভাবতে পারে না, এ পৃথিবীতে দাদার আয়ু নাম্বারড্‌ হয়ে গেছে। যেকোন দিনই চলে যেতে পারেন।

সুনন্দা সেটা বুঝতে পেরেই ঝটিতি উঠে দাঁড়ায়, তুমি হাত মুখ ধুয়ে এসো। আমি খাবারের জোগাড় করি।

—মা খেয়েছে?

—মাকে আটটার মধ্যে খাইয়ে শুইয়ে দিতে হয়। ওষুধ খাওয়া ঘুম। বেশী রাত হয়ে গেলে আর ঘুমতেই পারবেন না। আর দেরী কোর না। উঠে পড়। আর শোন, কাল তোমার কোন কাজ আছে?

—না, কেন বলত?

—আমার সঙ্গে ব্যাঙ্কে যাবে।

পাঁচ

প্রথম যৌবনে অবনীমোহন একটা ধাক্কা খেয়েছিলেন। অপরিণামদর্শী হঠকারিতা। আনপ্ল্যানড্‌, আনঅর্গানাইজড গণ-অভ্যুত্থান কিছু ব্রিলিয়াণ্ট ছেলেদের প্রথম যৌবনের আবেগকে কাজে লাগিয়ে তাদেরকে বিপ্লবের পথে এগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু অশিক্ষিত পটুত্ব দিয়ে যুদ্ধ জয় করা যায় না। তাদের

নেতাদের ভাবা উচিত ছিল, প্রতিক্রিয়াশীল দানবটা তাদের থেকেও অনেক বেশি শক্তিমান।

প্রায় অশক্ত যৌবনে আর একটি ভুল করেছিলেন। এটাও আবেগ। শিউলির কথায় আঁস্তাকুড়ে পরিত্যক্ত একটি মেয়েকে নিজের জীর্ণ বুকে তুলে নিয়েছিলেন পরিণামের কথা কিছু না ভেবেই। সেদিন তাঁর ভাবা উচিত ছিল, একদিন অহনা বড় হবে। ইচ্ছে করলেই তিনি তার জন্মবৃত্তান্ত লুকিয়েই অহনার বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারতেন। কিন্তু সত্যটাকে গোপন করে কিছুতেই তিনি অহনাকে পাত্রস্থ করতে চাননি। আর এটাই হয়েছে তাঁর সব থেকে বড়ো ভুল।

কেন, এটাকে তুমি ভুল বলছ কেন অবনীবাবু, খাবারের থালা এগিয়ে দিয়ে অবনীমোহনের মুখোমুখি বসতে বসতে শিউলি প্রশ্ন তুলে ধরে।

—হ্যাঁ, ভুল। আমাদের দুজনের কেউই একবারের জন্যেও ভেবে দেখিনি ভবিষ্যতে ওর জন্মবৃত্তান্ত জানার পর ও কতটা সহজভাবে তা মেনে নেবে!

—কিন্তু ওকে আমরা লেখাপড়া শিখিয়েছি। ওর এটুকু বোঝা উচিত কোন প্রাণীই তার জন্মের জন্যে দায়ী নয়। তাছাড়া একটি ছেলে বা মেয়ের কাছে বড়ো কথা পিতৃপরিচয়। তা তুমি ওকে দিয়েছ। এমন তো অনেক স্বামী স্ত্রী আছে যাদের কোন ছেলেপুলে হয় না। তারা তো নাম ধাম গোত্রহীন কোন অনাথকে পোষ্য নেয়।

—হ্যাঁ শিউলি। নেয়। ওর ক্ষেত্রেও তাই। কিন্তু ভুল হয়েছিল আরো অনেক ছোটবেলায় ধরো ওর আট কী ন বছর বয়েস থেকে ধীরে ধীরে ওকে সব কিছু জানিয়ে দিলে হয়তো ব্যাপারটা ও সামাল দিতে পারতো। আসলে আমাদের তখন মনে হয়েছিল সত্যি কথাটা জানলে, ঐ বয়েস থেকে ওর মাথায় যদি উল্টোপাল্টা ভাবনা গিয়ে পড়াশুনোটা মাটি করে দেয়।

—অহনা কী বলছে?

—সে এক অসম্ভব কথা।

—কী রকম?

—সী ইজ ভেরি মাচ অ্যাডামেণ্ট টু ফাইণ্ড আউট হার

পেরেণ্টস। তার আসল বাবা মাকে সে খুঁজে পেতে চায়। সে রাত্রে আমার মুখ থেকে সব কিছু শোনার পর, হিংস্র বাঘিনীকে তুমি কখনো দেখেছ কিনা জানি না, আমি দেখিনি, তবে আন্দাজ করতে পারি ওর চোখমুখের চেহারাটা ঠিক সেই রকমই হয়ে উঠেছিল। চোখ দুটো জ্বলছিল, মুখের চেহারাটা কি রকম যেন অদ্ভুত ভয়ংকর হয়ে গিয়েছিল। অনেক হিংস্র আর নৃশংস পুলিশের মারকুটে জল্লাদদের আমি দেখেছি, কিন্তু সেদিন থেকে অহনা কী ভয়ানক অস্থির হয়ে উঠেছে না দেখলে তুমি বুঝবে না, এমন কী যে ছেলেটিকে ও ভালোবাসতো,

—সুমন ?

—হ্যাঁ। শুনেছি তাকে নাকি নোংরা নোংরা কথা শুনিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে !

—কী করছে এখন ও ?

—আমাকে বলেনা। ও এক নিমেষে ভুলে গেছে আমার সব স্নেহ, ভালোবাসা, বাপের আদর যত্ন আর অভিভাবকত্ব দিয়ে বড়ো করে তোলার সব স্মৃতি। সামান্য কৃতজ্ঞতা বোধটাও পাগলি মেয়েটা ভুলে গেছে। ভোর না হতেই কোথায় বেরিয়ে যায়। ফেরে সেই রাত্রে। কিছু বলতে গেলেই বলে আঁস্তাকুড়ের জীবকে আঁস্তাকুড়েই চলতে দাও। তাছাড়া আমার নাকি তার সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করার অধিকারও নেই এমন কথাও মুখের ওপর বলে দিল।

—পোড়ারমুখীকে একটা থাপ্পড় কষাতে পারলে না ?

শিউলির দু চোখে রাগ ঝরে পড়ে। রাগ মিশ্রিত অভিমান ছড়িয়ে আবার বলে, তুমি ঠিকই বলেছ, সেদিন ওকে আঁস্তাকুড় থেকে বুকে তুলে না নিলেই ভালো হত। হয় মুখপুড়ি তখনি মরতো, নইলে অন্য কোন খারাপ লোকের পাল্লায় পড়লে, ওকে দিয়ে ব্যবসা করতো, নয় তো ডাগরটি হলে আরব মারবে পাঠিয়ে দিত। তাহলে হয়তো বুঝতো ভালোবাসার কী দাম ?

খুব করুণ হাসি মুখে ছড়িয়ে দিতে দিতে অবনীমোহন বলেন, না শিউলি, ঠিক এই মুহূর্তে রাগ বা অভিমান করা আমাদের সাজেনা। আমাদের বয়েস হয়েছে, ও যা বুঝতে পারছে না সেটাই তো ওকে আমাদের বোঝানো দরকার। গোপন

সত্যটা হঠাৎ জানতে পারলে তার সর্বপ্রথম মনে হবে যে অকৃতজ্ঞ বাবা মায়ের ক্ষণিক আনন্দের ফসল হয়ে এ পৃথিবীতে এসেছে তাদের মুখোমুখি দাঁড়াতে। অহনাকে তুমি ভুল বুঝোনা শিউলি।

—দেখো অবনীবাবু, অহনাকে তুমি কতোটা ভালবাস তা আমি জানি। নিজে বিয়ে করনি। যাকে ভালোবাসতে তাকেও পাওনি। নিজের বাবাকেও একদিন অবহেলায় ছেড়ে চলে গিয়েছিলে। কিন্তু তোমাকে চিনতে আমার ভুল হয়নি। তুমি যে মনে প্রাণে বড়ো কাঙাল। ভালোবাসা দেবার অথবা পাবার। আমি কী জানিনা অহনার জন্যে তোমার ভেতরটা কত ছটফট করছে।

—সে তো তোমারও করছে। তোমার অভিমানটাই তো তাই বুঝিয়ে দিচ্ছে। আজ তোমার পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। তুমি যদি তোমার স্বব্যবসায় থাকতে, যৌবনে যা রূপসী ছিলে, এতোদিনে অনেক কিছু গুছিয়ে নিতে পারতে। কিন্তু তা পারনি। পারতে চাওনি। ঠিক যখনি অনেক রোজগারের সুযোগ তোমার সামনে, সোনাগাছি ছেড়ে চলে গেলে অনেক দূরে। ব্যবসাপত্তর সব গুটিয়ে দিয়ে। কেন? নিজে অতি সামান্য মানুষের মতো বেঁচে থেকে মাসের পর মাস অহনার পড়ার আর সুখের খরচ জুটিয়ে গেছ, কেন?

—জানিনা, শিউলির মুখে তখনও অভিমানের তবকে মোড়া নকল রাগ।

—আমি জানি। সব ঐ অহনার জন্যে। জীবনের অঙ্কে হেরে গিয়ে তুমি হয়েছিলে পতিতা। কিন্তু মায়ের চিরকালীন প্রাণটাকে তো মেরে ফেলতে পারনি।

—থাক ওসব কথা। বেশ্যার আবার মা হওয়া।

—উহুঁ, তোমাকে আমি আগেও বলেছি, আজও বলছি। বেশ্যা হয়ে কেউ জন্মায় না, তাকে বেশ্যা করা হয়। তবে তুমি যে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলে এতেই আমি খুব খুশী হয়েছি।

—অবনীবাবু, ও জল আর ঘোলা কোরনা, যা থিতিয়েছে তাকে থিতিয়ে যেতেই দাও। আমি একটা কথা ভাবছিলাম।

—হ্যাঁ বলো। তোমার সঙ্গে আলোচনা করব বলেই তো অতদূর থেকে এই শরীর নিয়ে ছুটে এলাম।

—বিনা কারণে যে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করো না তা আমি জানি।

—বয়েসটাই বাড়ালে শিউলি, কিন্তু অভিমানটা কমাতে পারলে না। আর কটা দিনই বা আমরা বাঁচব। তুমি আমার কাছে যা চেয়েছিলে তা আমি দিতে পারিনি, কিন্তু এটুকুতো বোঝ রমিতার জায়গাটা তোমায় আমি কোনদিনই দিতে পারতাম না। কিন্তু তোমার জন্যে আমার দরদ আর ভালোবাসা, এগুলো কি তুমি বুঝতে পার না?

চট্ করে কোন উত্তর না দিয়ে শিউলি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। বোধহয় ওর চোখে জল এসেছিল। কাপড়ের খুট দিয়ে চোখটা মুছে নিয়ে বলে, কথাটা যখন একান্তই তুললে, আর নিজের মুখে যখন স্বীকার করলে আমার জন্যে তোমার দরদ আর ভালোবাসা ছিল, তখন আমাকে আর একটু পূর্ণ হতে দিলে না কেন? রমিতার জায়গা কী শিউলিরা কোন দিনই পেতে পারে না? রমিতারা হাজার অন্যায় করলেও না।

—শিউলি!

—হ্যাঁ অবনীবাবু, পাপ ব্যবসা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম একটা স্বপ্ন দেখছিলাম বলে। যদিও ঐ স্বপ্ন আমাদের দেখা উচিত নয়, তবু মেয়ে হয়ে ঐ একটা স্বপ্ন তো সব মেয়েরাই দেখে। ও স্বপ্ন আমি দেখতাম না। কিন্তু ঐ মুখপুড়িটাকে যখন তুমি পিতৃপরিচয় দিয়ে নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে রাখলে, তখন আমার বড়ো ইচ্ছে হয়েছিল মা হবার, অহনার মা হয়ে একটা ছোট্ট সংসার করার।

—আমি সব জানি অহনা।

—আর তুমি যে আমায় ঘেন্না করোনা তাও আমি জানতাম।

—তবু শিউলি, রমিতার কথা বাদ দিলেও আরো একটা বড়ো সত্য কথা শোন। সে সময় এক বিপন্নতা আমায় চেপে ধরেছিল। মুখে আমি যতই শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজব্যবস্থার কথা বলি না কেন, আমিও তো সেই প্রতিক্রিয়াশীল আবহাওয়ায় গড়ে ওঠা এক সামান্য মানুষ। সত্যিই আমাদের দ্বারা কিছু হবার ছিল না। অহনাকে মেয়ে বলতে আমার কুণ্ঠা আসেনি। কিন্তু তোমাকে স্ত্রী বলতে—। আসলে মনে প্রাণে আমার কোন উত্তরণই ঘটেনি।

এও আমার এক বিস্ময়। আমিও সেই তাদের মতো যারা বেশ্যার পাশে শুয়ে রাত কাটাতে পারে কিন্তু তাকে ঘরণী করতে পারে না। অনেক অনেক কাল ধরে যে কিছু স্বার্থসর্বস্ব মানুষ তাদের সুবিধামতো সংস্কারের বেড়ি পায়ে পরিয়ে শিক্ষার নামে অশিক্ষায় আমাদের নামকোয়াস্তে সামাজিক প্রাণী করে রেখেছে। আসলে ভূতটা যে সর্ষের মধ্যেই ঢুকে আছে।

হঠাৎ অবনীমোহন উঠে দাঁড়ান। অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শিউলি বলে, বলা নেই কওয়া নেই, উঠে দাঁড়ালে কেন? আমাকে কী অতই লোভী ভাব?

—তুমি যদি লোভী হতে তাহলে হয়তো আমি জীবনের একটা মানে খুঁজে পেতাম। আমি যাই। যেতেও হবে অনেকটা। মাথার মধ্যে আবার কী সব কিলবিল করতে আরম্ভ করল।

—কিন্তু যা বলতে এসেছিল সেটাই তো ধামাচাপা পড়ে গেল। অহন র ব্যাপারে কী ঠিক করলে?

—ওকে ফেরাতে হবে। ও যে ভুল করছে সেটা ওর মাথায় ঢুকিয়ে দিতে হবে। এছাড়া আর কোন ভাবনা তো মাথায় আসছে না।

—বেশ তো, সেটা কেমন করে? তুমি যদি বলো তাহলে আমি নয় ওর সঙ্গে একবার দেখা করি।

—কী বলবে?

—যা সত্য, তাই।

—তাতে যদি উল্টো কোন বিপত্তি হয়?

যাই ঘটুক, তাকেই সত্যি বলে মেনে নিতে হবে।

—আর মেয়েটা বুনো হাঁসের পালকের খোঁজে ছুটতে ছুটতে যদি হঠাৎ কিছু করে বসে?

—তাহলে সেটাই শেষ সত্য, তাও মেনে নোব।

—বেশ তোমার যা ইচ্ছে হয় তাই করো।

—সুমনের বাড়িটা কোথায়?

—সামনের ফ্ল্যাটে থাকে।

—ছেলেটি কেমন?

—কেমন মানে?

—মানে কতটা তোমার অহনাকে ভালবাসে ?

—তাও জানিনা।

।। ছয় ।।

অহনার টিউশনিটা শেষ হয়ে গিয়েছিল আটটার সময়। আষাঢ়ের শেষ। রীতিমত বর্ষাকাল। বাইরে বেরিয়ে দেখে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে! রাস্তা কাদায় কাদা। ছাতা খুলেও উল্টোমুখে হাঁটা শুরু করল। আগে হলে এক মুহূর্ত দেরী না করে সোজা বাড়ি ফিরে আসতো। সে না ফেরা পর্যন্ত অবনী হাপিত্যেশ করে বসে থাকবেন! কিন্তু মাত্র কদিনেই সব কিছু ওলট পালট হয়ে গিয়েছিল। প্রতি মুহূর্তে একটা কথাই তাকে খোঁচা দিয়ে চলেছে। এ সংসারে তার কোন পরিচয় নেই। সে জানে না কে তার বাবা কে তার মা। কোন বংশের মেয়ে সে? নাকি ঐ বেশ্যা পাড়ারই কারো? কিন্তু ঐ পাড়ার কারো মেয়ে হলে কোন বারবনিতাই মেয়ে সন্তানকে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেবে না। ভবিষ্যতের কথা ভেবে। তার মানে সে কারো অপরিণামদর্শিতার ফল। কিন্তু বাইশ বছর পর আর কী কোনভাবে তাদের খুঁজে পাওয়া যাবে? অবনী রায়ের মুখে শুনেছে কে এক শম্ভু দালাল তাকে কুড়িয়ে পেয়েছিল। লোকটা দালাল। কিন্তু বাইশ বছর আগের সেই দালালকেই বা সে চিনবে কেমন করে? খুঁজেই বা পাবে কেমন করে? পেলেও সে হয়তো অনেক বুড়িয়ে গেছে। তার হয়তো মনেই নেই কুড়িয়ে পাওয়া এক মেয়ের কথা।

আর একজন জানে তার সব কথা। শিউলী! কিন্তু বাবির মুখে শুনেছে শিউলি নামের সেই বারাঙ্গনা আজ আর সোনাগাছিতে থাকে না। একমাত্র বাবি ছাড়া তার ঠিকানাও কেউ জানে না।

হেদুয়ার কাছে তার ছাত্রীর বাড়ি। নিজের মনে হাঁটতে হাঁটতে সে চলে এসেছিল প্রায় ছাতুবাবুর বাজারের কাছে। সে শুনেছে আরো খানিকটা গেলেই নাকি সোনাগাছি।

একটা ঘোর। যে ঘোরটা তাকে দিনের পর দিন ভেতরে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে। সেই আগুনটাই তাকে ঠেলে নিয়ে এসেছে এতোটা পথ।

কিন্তু হঠাৎই সম্বিত ফিরে পায়। এ একধরণের পাগলামি। শুধু পাগলামি নয়। আত্মহত্যার নামান্তর। বাইশ বছরের সুন্দরী তরতাজা একটা মেয়ে রাত আটটার পর সোনাগাছি যাবে শম্ভু দালালকে খুঁজে বার করতে? সেটা তো সম্ভব নয়ই, উপরন্তু সে শুনেছে জায়গাটা এ সময়ে নরক হয়ে থাকে। সেই নরকের রাস্তায় একা একটি মেয়ের এলোমেলো ঘোরাঘুরিটা আত্মহত্যারই সামিল।

বর্তমান মানসিকতায় আত্মহত্যাটা তার কাছে বিরাট কোন ভাববার ব্যাপার নয়। যে কোন মুহূর্তে সেটা সে করতে পারে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য যে অন্য। তাকে খুঁজে পেতে হবে তার জন্ম পরিচয়।

অবনী অনেক যুক্তি দিয়েছিলেন। আজকের দিনে জারজ সন্তান বলে কিছু থাকতে পারে না। যে কোন শিশুরই একজন বাবা আর একজন মা থাকবেই। নানা সামাজিক কারণে কোন কোন সন্তান জানতে পারে না কে তার বাবা আর মা। সেখানে শিশুর কোন অপরাধ নেই। প্রতিটি শিশুই মানবসন্তান। মানুষের একটাই পরিচয় সে মানবপুত্র। বহু শিক্ষিত এবং সন্তান উপেক্ষিত দম্পতি, বংশ পরিচয় না জেনেই শিশুকে দত্তক নেয়। তারপর সেই দম্পতির পরিচয়েই সে পরিচিত হয় মানব সমাজে।

সহস্র প্রাঞ্জল আর প্রগতিশীল ভাবনায় অবনীমোহন অহনার জন্ম রহস্যকে উপেক্ষা করতে পারেন, অহনা তা পারে না। বদলে সেই জ্বালা আর তীব্র হাহাকার তার মধ্যে ঢুকে পড়ে তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিচ্ছে। একটা প্রতিশোধ বাসনা ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে। আর সেই জ্বালা আর হীনম্মন্যতাই একদিন সুমনকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। তার সব রাগের প্রথম বহিঃপ্রকাশ।

সুমন। তার একান্ত ভালবাসার মানুষ। তার কৈশোরের সাথী। জ্ঞান হবার পর থেকেই সে সুমনকে ভালবেসে ফেলেছে। নিজেকে ওর কাছে উজাড় করে দিয়েছে। দেহে আর মনে। কিছুই তো তাকে অদেয় ছিল না। আর সুমনও তাকে ভালোবাসতো পাগলের মতো। একমাত্র থিয়েটারের নেশা ছাড়া সুমনের আর কোন নেশা নেই। সুমনের থিয়েটার পাগলামিটা অহনার ভালো লাগতো

না। সে শুনেছে যারা ঐ সব লাইনে থাকে তারা নিজেদের চরিত্র ধরে রাখতে পারে না। তবু, সে মেনে নিয়েছিল। আসলে সুমনকে স্টেজে দেখতে গিয়ে সে এক প্রতিভাবান যুবককে খুঁজে পেতো। পুলকিত হত তার ক্ষমতা প্রকাশের ব্যঞ্জনায়। তাই নিজের ভাল না লাগা সত্ত্বেও সে মনেপ্রাণে মানুষ সুমনকে চেয়েছিল।

অবনীমোহনের কাছ থেকে নিজের জন্মরহস্য শোনার আগে পর্যন্ত ঠিকই ছিল ওরা বিয়ে করবে। কিন্তু, তারপরই সব ওলটপালট। আসলে যে সামাজিক পরিবেশে ও বেড়ে উঠেছে সেখানে সব শিশুই আশা করবে তার একজন নিয়মমত বাবা মা থাকবে। সেই নিয়মের বাইরে আর কিছু থাকতে পারে এ বোধই তার ছিল না। আর সেই বোধটাই হোঁচট খেল। তথাকথিত মধ্যবর্তী মানসিকতায় এ এক বড়ো আঘাত। হাজার যুক্তিতর্ক দিয়েও হঠাৎ আসা ঝড়টাকে সে সামলে উঠতে পারছিল না।

একা একা হাঁটতে হাঁটতে সুমনের জন্যে ওর মনটা ছটফটিয়ে উঠল। ও তো কোন দোষ করেনি। সে নিজেও কোন দোষ করেনি। তবে কেন ও সেদিন অত নির্মম হয়ে উঠল সুমনের প্রতি। নিজেও অনেকবার ভেবেছে যে কোন মানুষের জন্ম একটা অ্যাকসিডেন্ট! ভূমিস্ট শিশুর তাতে কোন হাতই থাকে না। আর সুমন অত্যন্ত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর ছেলে। সব কথা শুনলে মাছি তাড়ানোর মতো ঘটনাকে উড়িয়ে দিতো। বুঝতেই দিত না এটা আবার কোন ভাবার বিষয় হতে পারে।

কিন্তু পারে। সুমন যা করতো সেটা হয়তো তাৎক্ষণিক আবেগে করতো। মানুষ সুমনের থেকে আবেগতাড়িত সুমনকে ওর ভালভাবেই চেনা। যদি কোনদিন তাকে আর সুমনের ভালো না লাগে, অথবা দৈনন্দিনতার চাপে তার প্রথম আবেগ খোয়া যায়, যদি কোনদিন সে মুখের ওপর বলে দেয়, তার কোন খুঁত ধরে যদি বেপরোয়া ঘোষণা করে, ইউ আর আ ব্লাডি বিচ্। তোমার কোন জন্মের ঠিকঠিকানা নেই। সেই চরম অপমান আর ভালোবাসার মৃত্যু চিন্তায় অহনা দিশেহারা হয়ে যায়।

ভালোই করেছে, সুমনকে তাড়িয়ে দিয়ে। সবাই তো আর অবনীমোহন নন। জীবনের সব গরলকে কণ্ঠে নিয়েও অথর্ব অশক্ত শরীর নিয়েও, তার মতো একটি মেয়েকে বুকে তুলে নিতে

পেরেছিলেন। সে ভদ্রলোক আজও তাকে পিতৃস্নেহে আগলে নিজে অবিবাহিত হয়েও তার পিতৃপরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হননি।

অহনা জানে, পৃথিবীর সব মানুষ সমান নয়। মানুষের মাঝেই গরল আছে, সুধাও আছে।

কিন্তু! ঐ কিন্তুতেই সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না, সে এক জারজ সন্তান! নিজের কাছেই নিজেকে বড় ছোট মনে হচ্ছে।

হঠাৎ বৃষ্টির তোড়টা বেড়ে গেল। শম্ভু দালালের খোঁজ নিতে যাবার বাতুলতা ত্যাগ করে ও মানিকতলার দিকে হাঁটা শুরু করল। নাঃ এভাবে কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না। এ এক ধরণের হঠকারিতা। ঠিক এই সময়ে কাউকে পাশে পেতে খুব ইচ্ছে করছিল। এমন কেউ যে এসে তার সব অসহায়ত্ব কেড়ে নিয়ে তার বলিষ্ঠ হাত দিয়ে সব মালিন্য কাটিয়ে তার সমব্যথী হবে। আবার মনে পড়ল সুমনের কথা। একমাত্র সুমন ছাড়া তার আর কোন পুরুষ বন্ধু নেই। একমাত্র সুমন, যার কাছে তার সব হাসি, কান্না, সুখ, দুঃখ আর অভিমান প্রকাশ করা যায়। যার ওপর সে নির্ভর করতে পারে। বেলেঘাটার সি আই টি ফ্ল্যাটে যখন এসেছিল তখন তার কতই বা বয়েস। পাঁচ কি ছয়। তারপর অবনীর আশ্রয়ে থেকে, তাকেই তার বাবা জেনে নিজের মনে লেখা-পড়া শিখেছে। জ্ঞান হবার পর থেকেই সে জেনেছে অবনীর ছোটবেলার কথা। তার টলটলে পারদের মতো মনে তীব্র ঘৃণা সৃষ্টি হয়েছে শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে। তবু অবনীর কড়া পাহারায় থেকে সে কোনদিনও কোন প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তির কথা ভাবেনি। অবনীও চেষ্টা করেছেন অহনা থাক সাধারণ একটি মেয়ে হয়ে। নিজের জীবন দিয়েই তিনি উপলব্ধি করেছেন, বোকার মতো কোন রাজনৈতিক ভূতেদের যজ্ঞে মেয়েকে পাঠাবেন না। মাত্র বারো বছর বয়েসে তার প্রথম আলাপ ঐ সুন্দর সুপুরুষ ছেলেটার সঙ্গে। কয়েক গজের চওড়া রাস্তার ব্যবধানে থাকা সুমনকে তখন থেকেই তার ভাল লেগেছিল। আর প্রেম কখন কার মধ্যে এসে পড়ে ভাসিয়ে ডুবিয়ে একাকার করে দেয় সে বোধ দুজনের কারোরই ছিল না। সুমনকে অবনীরও ভাল লাগতো। তিনি কোনদিনও মেলামেশায় আপত্তি জানাননি। তাই তাদের মধ্যে

একসময় অবাধ প্রেমের ব্যাপার ঘটে গিয়েছিল। একটা সময় তার মনে হত সুমন ছাড়া সে বাঁচবে না। সুমন ছাড়া অন্য কেউ তার স্বামী হতে পারে না।

অথচ সেই সুমনকেই কী না বলে সে অপমান করেছে। ওই সব ভাষা সে শিখলই বা কার কাছ থেকে? অবনীকে কোনদিনও কোন কটু কিছু বলতে শোনেনি। তবে কী তার অজানা জন্মের মধ্যে কোন ইতরের রক্তস্রোত তার মধ্যে প্রবাহিত? এমন কোন জিনের প্রভাব নিশ্চই তার মধ্যে আছে যা তাকে হয়তো অনেক নীচেও নামাতে পারে। নইলে কেনই বা তার মনে হয় যদি কোন দিন সেই অপরিচিত বাবা মাকে খুঁজে পায় তাহলে তাদের খুন পর্যন্ত করতে পারে। ইদানীং সে প্রায়ই লক্ষ্য করেছে একটা জান্তব নৃশংসতা তাকে ক্রমাগত গ্রাস করছে।

সত্যিই অহনা জানে না ভবিষ্যতে সে কী করবে। কিন্তু তাদেরকে খুঁজে বার করতেই হবে।

এস-টুয়েলভ বাস থেকে নেমে অত্যন্ত শ্লথ পায়ে সে হাঁটছিল। বাস টার্মিনাস থেকে একটুখানি পথ। খুব গমগমে রাস্তা নাহলেও অটোওয়ালাদের একটা ছোটখাটো ভীড় থাকেই। এখানে তার ভয়ের কিছু নেই। মোটামুটি সবার সঙ্গেই একটা হালকা মুখচেনা আছে। বৃষ্টিটা তখনও পড়ছিল। তাই জোরে হাঁটার ইচ্ছে বা তাগিদ কোনটাই নেই। এখন প্রায়ই মনে হয় এতদিন পরবাসী হয়ে একজনের বাড়িতে সে অনধিকার বাস করেছে। ফিরছেই বা কোথায়? কার কাছে? অবনীমোহন নামে একজন আদর্শবান মানুষের অনুগ্রহ আর বদান্যতাই আজ বড়ো হয়ে দেখা দিচ্ছে। এতোদিন পিতৃজ্ঞানে যার ওপর সে জোর ফলিয়েছে আজ মনে হয় নিজের অজ্ঞাতে মানুষটার ওপর অনেক অন্যায় করে গেছে। এ অন্যায় থেকে পার পাবার একটাই উপায়। ঐ মানুষটার ওপর আর অত্যাচার না করে কোথাও নিমেষে হারিয়ে যাওয়া। কিন্তু এই বিশাল পৃথিবীটার কোন রাস্তাই তো তার জানা নেই। বাইরের জগতটার সঙ্গে তার পরিচয়টাও বড় গণ্ডীবদ্ধ।

সুমনের ফ্ল্যাটের সামনে এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। বৃষ্টির জন্যেই সম্ভবত ওদের-ঘরের জানলা দরজা বন্ধ। কিন্তু দাঁড়ালোই

বা কেন ? সে কী সুমনের সঙ্গে দেখা করতে চায় ? পরক্ষণেই মনে হল, আর তা হয় না। এ পৃথিবীতে আর কারো বোঝা হয়ে সে বেঁচে থাকতে চায় না। হয়তো পারবেও না। অবনী-মোহনের মাত্র কয়েকটি কথাতে জীবনের মানেটাই গেছে বদলে।

হঠাৎই ওর মনে হল শিউলি মাসীর কথা। শিউলি মাসীর সঙ্গে অবনীমোহনের সম্পর্কটাই বা কী তাও ওর ধারণায় নেই। কিন্তু শিউলি মাসীর ইচ্ছেতেই অবনীমোহন তাকে নিজের কাছে এনে রেখেছে। এবং শিউলি মাসী শম্ভু দালালকে চেনে। একমাত্র ঐ মহিলাই চেষ্টা করলে শম্ভু দালালের ঠিকানা বলতে পারবে।

অহনা ঠিক করল, যেমন করেই হোক শিউলি মাসীর সঙ্গে তাকে দেখা করতেই হবে।

।। সাত ।।

ক্লিক্ করা বলে একটা শব্দ আছে ভাগ্যের ব্যাপারে। সুমনের ক্ষেত্রে বোধহয় ঐ রকমই একটা কিছু ঘটতে চলছিল। এ পর্যন্ত সে থিয়েটার করেছে। ধার দেনা করে কোন রকমে অল্প কিছু সুদের বিনিময়ে টাকা পরিশোধের কড়ারে 'শরশয্যায় ভীষ্ম' প্রেস শো পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর পারানির কড়ি যখন প্রায় শেষের মুখে ঠিক তখনই কস্তুরী সান্যালের নজরে পড়া। কস্তুরী সান্যালের বদান্যতায় একটা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার শুরু। যেটা সে আগে কোনদিনও ভাবেনি। আর প্রথম সুযোগটাই তার কাজে লেগে গেল। মনিটরে নিজের ছবি দেখে নিজেই বেশ পুলকিত হয়েছিল। তারপর ফাইন্যাল ক্যাসেটে মিউজিক টিউজিক দিয়ে যখন টিভির পর্দায় ভেসে উঠল নিজের রোম্যাণ্টিক ছবিটা তখন তার মনে হয়েছিল এতদিন কেন এ দিকটা নিয়ে সে ভাবেনি। তার উচিত স্টেজের গণ্ডী ছাড়িয়ে বড় বা ছোট পর্দায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। অবশ্য স্টেজকে বাদ দিয়ে নয়।

গত পরশু কস্তুরীই তাকে ফোন করেছিল। তার নিজের কোন ফোন নেই। তাদেরই ব্লকের একেবারে শেষপ্রান্তে ডাঃ অসীম ভট্টাচার্যের ফ্ল্যাট। ডাক্তারবাবুর বয়েস্ হয়েছে। জীবনে

রোজগারও করেছেন অনেক। কিন্তু একটা দুর্ঘটনায় একই সঙ্গে স্ত্রী পুত্রকে বিসর্জন দেবার পর উনি আর নিজের শখ শৌখিনতার দিকে নজর করেন নি। ইচ্ছে করলেই যিনি যে কোন পশ এলাকায় মনের মতো বাড়ি অথবা ফ্ল্যাট কিনতে পারতেন। কিন্তু তিনি রয়ে গেলেন আগের মতোই সামান্য দেড় কামরার বাসিন্দা হয়ে। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে সুমনের আঁতাত ভালো। একক জীবনে তাঁর একটিই হবি। নাটক পাগল মানুষ তিনি। সেরা সেরা দলের সেরা নাটকগুলো তাঁর সব দেখা। 'শরশয্যায় ভীষ্ম' দেখে তিনি কেবল অভিভূতই নয়, একদিন সুমনকে ডেকে নাটকের বর্তমান গতি-প্রকৃতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন, ফাঁক পেলেই দুজনে আলাপ আলোচনায় বসে যান। সুমনের নিজস্ব ফোন না থাকায় উনি নিজেই বলেছিলেন দরকার হলেই সুমন তার ফোন ব্যবহার করতে পারে।

কস্তুরীর ফোন আসতেই ডাক্তারবাবু ওকে ডেকে এনেছিলেন। ওপাশ থেকে মিষ্টি রহস্যময় গলাটা ভেসে এসেছিল, কাল ঠিক সকাল সাড়ে নটার মধ্যে অফিসে চলে এসো। অনেকগুলো কাজ এসে গেছে। মিস্ করো না যেন।

মিস্ করার প্রশ্নই ছিল না। কারণ সুমন তখন অন্য জগতের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে।

সেই শুরু। বেশ কয়েকটা অ্যাডের কাজ করার পর ও নিজেই একদিন বলেছিল, কস্তুরীদি, আমি কী শুধু অ্যাড নিয়েই পড়ে থাকব?

কস্তুরী তখন নতুন একটা অ্যাডের স্ক্রীপ্ট্ আর লে আউটে চোখ বোলাচ্ছিলেন। মুখ না তুলেই প্রশ্ন করলেন, তাহলে আর কী করতে চাও? নাটক তো করছই।

—তা করছি।

—তাহলে?

—একটু বড়ো পর্দায় যাওয়া যায় না? আপনার তো অনেক সোর্স।

কস্তুরী সরাসরি সুমনের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে ছিলেন। বক্ষ বিদির্ণ করা চাহুনী। একে তো মহিলা দারুণ সুন্দরী। তারওপর চোখের পাতাগুলো বড়ো বড়ো হওয়ায় দৃষ্টিটা আরো

মোহময়ী হয়ে ওঠে। ব্যক্তি জীবন আর মঞ্চ জীবনে অনেক ফারাক। ঐ চাহুনী স্টেজে হলে তার রিঅ্যাকশান হতো অন্য রকম। কিন্তু নিতান্তই ঘরোয়া পরিবেশে এবং নির্জন ঘরে ঐ রকম একটা ভয়ংকর সুন্দরীর চোখের দিকে তাকাতেই তার বুকটা কেঁপে উঠেছিল। চোখ নামিয়ে বলেছিল, অভিনেতা সুমনের চোখে যে স্বপ্নের কাজল পরিয়েছেন আপনি। তাই অভিনয়টাকে আরো ব্যাপকভাবে অনেক মানুষের কাছে পেঁছে দিতে চাই।

—উঁহু, আলতো করে ঘাড় দোলাতে দোলাতে কস্তুরী বলে ছিলেন, ব্যাপারটা তা নয়। তুমি কেরিয়ারিস্ট হতে চাইছ।

—বলুন প্রফেশনাল হতে চাইছি। নেশাকে পেশা করে তুলতে না পারলে পারফেকশানে পেঁছনো যায় না।

—একই কথা। কিন্তু ধরো, সুযোগ পেলে, হু হু করে চাহিদাও বেড়ে গেল। তখন না পারবে নিজের দলকে সময় দিতে, কে জানে হয়তো আমাকেও আর সময় দিতে চাইবে না।

—এ সব কী বলছেন আপনি? স্টেজ ইজ মাই ফার্স্ট লাভ। ওটাকে এড়িয়ে যাবার কথা ভাবতে পারি না। অল রেডি আমি একটা নতুন নাটকে হাত দিয়ে ফেলেছি। নাটকটা ঘষামাজা করে একটা জায়গায় নিয়ে এসেই নতুন প্রোডাকশনে হাত দোব। আর দ্বিতীয় যে কথাটা বললেন, ওটা আমার ক্যারেকটারের বাইরে। আপনাকে বলিনি, ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটা অ্যাডফার্ম আমার কাছে এসেছিল, তাদের ওখানে কাজ করার জন্যে। কিন্তু যাইনি। আর,

—আর সেটা কস্তুরী সান্যালের জন্যেই। তাইতো?

সুমন কিছু বলে না। কস্তুরীই আবার খেই ধরেন, সে আর কদিনের জন্যে? আরো দু একটা অ্যাড্ করলে হয়তো কিছু পয়সা পেতে, কিন্তু কস্তুরী সান্যালকে কী পেতে? তবে একটা বাস্তব কথা, তুমি উন্নতি করবে। নাঃ অ্যাড ফিল্মে নয়। অ্যাডে যারা কাজ করতে আসে প্রত্যেকেরই মনোবাসনা থাকে বড় ছবিতে কাজ করার। অনেকে যায়ও। কিন্তু এলেম না থাকায় আবার পিছিয়ে আসতে হয়। তোমার ক্ষমতা আছে। তাই ভয় করে।

—কিসের?

—যেটা বললাম। একবার ভাগ্য দিতে আরম্ভ করলে কস্তুরী সান্যাল কী আর তোমাকে ছুঁতে পারবে?

—সে রকম দিন যদি সত্যই আসে তাহলে আর একজন সুমন সেনকে তৈরী করে নেওয়াটা কস্তুরী সান্যালের পক্ষে শক্ত হবে না।

—নাহ্, তুমি বড়ো আবেগে চল। আর্টিষ্ট তো! এনিওয়ে, তোমার কথা আমি মনে রাখব। কিন্তু প্রতিদানে আমি কী পাব? কি দেবে আমাকে?

—আপনি কী পাবেন জানি না। তবে দেওয়ার মতো বস্তু বা সামর্থ আমার কতটুকু?

—কথাটা মনে রেখো। আমি কিন্তু কিছু চাইলে তা পেতে অভ্যস্থ। যাক সে কথা, এবারের কাজটা একটু টাফ্। তুমি বাইক চালাতে পারো তো?

—একটু আধটু। আমার এক বন্ধু নিতাইয়ের গাড়িতে হাতে খড়ি।

—এবারের অ্যাড্‌টা একটা বাইক কোম্পানির। একটি ছেলে বাইক নিয়ে এবড়ো খেবড়ো জঙ্গলের রাস্তা ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়াবে এক পাল হাতি। ছেলেটি হাত ঘড়ি দেখবে। অর্থাৎ তার তাড়া আছে। হাতির দলকে পাশ করতে দিলে তার সঠিক জায়গায় পেঁছিতে দেরী হয়ে যাবে। অগত্যা··· হিন্দী ছবিতে তো দেখোই হাতিদের মাথার ওপর দিয়ে বাইক উড়িয়ে নিয়ে একশো গজ দূরে গিয়ে পড়বে এবং ঠিক সময়ে শহরে পেঁছে যাবে। অর্থাৎ তার বাইকের কাছে কোন বাধাই বাধা নয়। এই হোল মোদ্দা ব্যাপার।

—সর্বনাশ, বলেই সুমন মাথায় হাত দিয়ে বলে, শূন্যে বাইক চালাব? আমার পক্ষে সম্ভব নয়। স্যরি কস্তুরীদি।

—দূর পাগল। তোমাকে কী আর সত্যি সত্যি হাতিদের মাথার ওপর দিয়ে বাইক নিয়ে যেতে হবে? ওটা ক্যামেরার কারসাজি। যাইহোক, আজ হচ্ছে শুক্রবার। আমরা সোমবার দুপুরের ট্রেনে যাচ্ছি জলদাপাড়া। তিস্তা তোর্সা ধরব। তুমি আমার বাড়িতেই চলে এসো। এখানেই খাওয়া দাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়ব, ওকে!

কোন ভালো খবর টবর থাকলে আগে ও অহনাকে গিয়ে

বলতো, কিন্তু সুনন্দা এ সংসারে আসার পর কাছাকাছি বয়েসের মেয়েটিকে ও নিজের মতো মনে করে সব কিছু বলে। তার সুখ দুঃখের কথা। তার জেতার কথা, হারার কথা। আসলে সুনন্দাকে বৌদি নয় বন্ধুর মতো করে দেখতে চাইতো। বাবাকে হারিয়েছে ছোটবেলায়। বাবার অফিসেই দাদার চাকরি। দাদাই সব কিছু সামলেছে। মায়ের আদর টাদরও ওর ভাগ্যে বেশী জোটেনি। ওর জ্ঞান হবার পর থেকেই দেখেছে মায়ের নর-ম্যালিটিটা কম। পরে, বাবা মারা যাবার পর এখন টোট্যালি ডেফ অ্যাণ্ড ডাম্ব। দিনের পর দিন ঘুমের ওষুধ খেতে খেতে এখন সব সময়েই হয় ঘুম নয় ঘোর।

ইদানীং কয়েকটা ব্যাপারে ওকে বড় ধন্দে ফেলে দিচ্ছিল। প্রথমতঃ প্রায় পঙ্গু এবং যে কোনদিন শেষ দমটুকু ফুরিয়ে যাবার অপেক্ষায় থাকা দাদার চোখে মুখে এক অস্বাভাবিক পরিবর্তন। বিশেষ করে সেটা সুমন বাড়ি ঢুকলেই। রাগ রাগ অবিশ্বাসী চোখে তাকানো, কিছু জিজ্ঞাসা করলে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেওয়া যেন দিন দিন বেড়েই যাচ্ছিল। সুনন্দাকে ও জিজ্ঞাসা করেছিল। সঠিক কোন উত্তর না দিয়ে সুনন্দা হেঁয়ালি করে বলেছিল, পাছে তুমি আমার সঙ্গে প্রেম ট্রেম করে বসো· তাই হিংসে হচ্ছে।

—ধ্যাৎ, কী আবোল তাবোল বকছ ?

কথাটা সুমন উড়িয়ে দিতেই চেয়েছিল। কিন্তু সম্ভাবনাটা মন থেকে একেবারে উড়িয়ে দেয়নি। সুনন্দার মধ্যেও একটা রোম্যাণ্টিক পরিবর্তন বেশ কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করেছিল। দাদা অসুস্থ হবার আগেও সুনন্দার সঙ্গে ওর সম্পর্ক বেশ মধুরই ছিল। অহনাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসাও করতো। প্রায়ই বলতো, আর কদ্দিন তোমাদের সংসার একা একা টানব, অহনাকে নিয়ে এসো পার্মানেণ্ট করে, তারপর দুই জায়ে মিলে— ।

এখন কিন্তু ভুলেও অহনার নাম উচ্চারণ করে না। দাদা কেমন আছে জিজ্ঞাসা করলে বলে, ওর আর থাকা না থাকা।

তারপর, যেদিন ও প্রথম রোজগার করে সুনন্দার হাতে টাকা তুলে দিয়েছিল। খট্‌কাটা সেদিনই প্রথম লাগে। পরে সুমন ভেবেছে সুনন্দার সেদিনের কথাগুলো ঠিক সোজা নয়। কোন বিশেষ তাৎপর্য লুকিয়ে আছে। ইদানীং ও বাড়ি থাকলে অথবা

লিখতে টিখতে বসলে কাছে এসে বসে থাকা, গল্প করা, খুনসুটি করা বেড়েই যাচ্ছিল। কোনদিন রাত করে বাড়ি ফিরলে উদগ্রীব হওয়া, কৈফিয়ৎ চাওয়া, ছোট ছোট অনুযোগ কিংবা বকুনি, নারী চরিত্রের এই সব বিশেষ ব্যাপারগুলো ঠাকুরপো বৌদির সম্পর্ক এড়িয়ে অন্য কিছুর ইঙ্গিত, এগুলো সুমন বুঝতে পারে। না পারার কোন কারণ নেই। সুমন এও বোঝে সুনন্দাকে দোষ দেওয়া যায় না। মাত্র তেইশ চব্বিশ বছর বয়েসের যৌবন। সামনে পড়ে আছে লম্বা জীবন। এবং মৃত্যুপথযাত্রী স্বামী। মন তার এদিক ওদিক যেতেই পারে। তায় সুমন স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ এবং সুন্দর মুখের এক যুবক। তবে কী দাদাও তাকে সন্দেহ করছে? কিন্তু সুনন্দা সম্পর্কে তার মধ্যে তো কোন দুর্বলতা নেই। থাকার কথাও নয়। দাদার সন্দেহটা স্বাভাবিক। সুনন্দার পরিবর্তনশীল আচার ব্যবহারও স্বাভাবিক। কিন্তু, এক্ষেত্রে তার তো কিছু করার নেই। একটাই মাত্র রাস্তা, সেই রাস্তাতেই ও এগিয়ে চলছিল। যতটা সম্ভব বাড়ির বাইরে থাকা।

আজও দেরী করে ফিরতে চেয়েছিল। কস্তুরী সান্যালের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ও চলে গিয়েছিল গ্রুপে। যদিও পুরনো নাটক। তেমন রিহার্সাল না করলেও চলে। কিন্তু ও সে মতে বিশ্বাসী নয়। ওর মতে নাটক নতুন হোক পুরনো হোক চর্চাটা নিয়মিত হওয়া দরকার। কিছু না হলেও বসে বসে চরিত্রগুলোর ডায়লগ আউড়ে যাও। তাতেও অনেক কাজ হয়। অ্যাটেন্ডেন্স-এর ব্যাপারেও ও ভীষণ কড়া। মহড়ার দিনে যার যতই কাজই থাক গ্রুপে আসতেই হবে। নিজেদের মধ্যে আলোচনা কর। আরো অন্য অন্য নাটক নিয়ে ভাবনাচিন্তা কর। নাটকের ঘরে নাটকের পরিবেশ তৈরী রাখো। এগুলো ওর মনের কথা। আর সেইগুলোই ও এখনও অ্যাপ্লাই করে চলেছে। একটা জিনিষ সুমন বিশ্বাস করে নাটকের ক্ষেত্রে কোন গণতন্ত্র চলে না। সেখানে ডিক্টেটরশিপ চালাতেই হবে। একজনকে অধিনায়ক হতেই হবে। নইলে গ্রুপ ধ্বসে যাবে।

প্রায় রাত নটা পর্যন্ত নতুন যে নাটকটা লিখেছে সেটা নিয়ে আলাপ আলোচনা সেরে ও যখন বাড়ি ফিরল তখন বাজে রাত সাড়ে দশটা। এবং ওর অনুমান মতোই সুনন্দা গালে হাত রেখে

বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে।

সুনন্দাকে ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সুমনের বুকটা সামান্য মোচড় দিয়ে উঠল। ঈশ্বর টিশ্বরে ওর কোনদিনও তেমন কোন বিশ্বাস ছিল না। আজও নেই। কিন্তু সুনন্দার দাঁড়ানোর ভঙ্গীটা দেখে ওর মনে হল, এ অন্যায়। অবিচার। প্রকৃতি কোন নিয়মে বা কার ইঙ্গিতে চলছে কে জানে, কিন্তু এই বয়েসে একটা মেয়ে তার সব আশা আকাঙখা হারিয়ে নিশ্চিত দুঃখের ভবিষ্যৎ দেখবে এটা ঠিক নয়। সুমন ঠিকই করে নিয়েছে দাদা মরলেই ও যেমন করে হোক সুনন্দার আবার বিয়ে দেবে।

বাড়ির কাছাকাছি এসেই বারান্দার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল। কোন প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে একই ভাবে দাঁড়িয়ে রইল সুনন্দা। সুমন মনে মনে হাসে, রাগ জমেছে।

ওদের ফ্ল্যাটটা একেবারে শেষের দিকে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে টানা লম্বা বারান্দা। খান চারেক ফ্ল্যাট পেরিয়ে ওদের ফ্ল্যাট। সুনন্দা তখনও দাঁড়িয়ে। জুতো খুলতে খুলতে ঠাট্টা করে, বলে আর প্রতীক্ষার দরকার নেই। এসে গেছি।

—বয়ে গেছে কারো জন্যে অপেক্ষা করতে।

—তাহলে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছ বল। কিন্তু দেখার মত তেমন মনোরম তো কিছু নেই। কটা রাতের কুকুর ছাড়া। চল ভেতরে চল।

—বিরক্ত করো না। যাও।

—মন ভালো নেই? দাদার কী ট্রাবল বেড়েছে?

—সেটা দাদাকে গিয়েই জিজ্ঞাসা কর।

—তথাস্তু দেবী। কিন্তু আমার একটা ইম্পট্যাণ্ট কথা ছিল।

—আমি কি তোমার বউ না লীগাল অ্যাডভাইসার?

—না দেবী, তুমি আমার ফ্রেণ্ড, ফিলজফার অ্যাণ্ড গাইড।

— ওসব মন ভোলানো কথা আর কাউকে বোলো। যাও হাত মুখ ধুয়ে নাও। আসছি।

সুমন ভেতরে চলে যায়। সেই একই দৃশ্য। খাটের নীচে পুঁটলির মতো ভোঁস ভোঁস শব্দে নাক ডেকে চলেছেন তার জননী। অর্থাৎ এখনও বেঁচে আছেন। আর খাটের ওপর দাদার প্রায়

মর্মর মূর্তি। চোখ দুটো বোজানো। নির্বিকার। এখন কোন বিদ্বেষের অভিব্যক্তি নেই। সম্ভবত ঘুমুচ্ছে। ও নিশ্শব্দে ফিরে এসে রান্নাঘর কাম বেডরুমের খাটিয়ায়। প্রতিদিনের অভ্যেস বাড়ি ফিরেই একবার খাটিয়ায় গড়িয়ে নেওয়া। মিনিট খানেকের মধ্যেই সুনন্দা ফিরে এলো। ওভেন জ্বালিয়ে চা বসিয়ে দিল। আড়চোখে একবার তাকাল সুমন। ওভেনের আঁচের মতোই নীলচে গনগনে তাপ তার সারা মুখে ছড়িয়ে রয়েছে। রাগ কার ওপর? তার ওপর এতোটা রাগ সুনন্দাকে মানায় না। তবে কী দাদা কোন খারাপ ব্যবহার করেছে? কে জানে।

কাপটা ধরিয়ে দিয়েই সুনন্দা চলে যাচ্ছিল। ত্বরিতে উঠে বসে খপ্ করে ওর হাতটা চেপে ধরল সুমন, কী হয়েছে, তোমার?

গনগনে উত্তর, কিছু না।

—তা বললে তো হয় না। ঐ মুখ আমি পড়তে পারি।

—কোন্ নাটকের ডায়লগ?

—নাটক নয়। সত্যিই।

—ভালো। শুধু তো অভিনেতা নও, নাট্যকারও বটে। বল কী বলবে?

হাতটা ছাড়িয়ে খাটিয়ার এককোণে বসে পড়ে সুনন্দা।

—আগে তোমার কী হয়েছে বল? তারপর আমারটা।

—তোমারটা আমি আন্দাজ করতে পারি।

—কী রকম?

—কোন ভালো কাজটাজ পেয়েছ।

—খানিকটা মিলেছে।

—খানিকটা? আরো কিছু আছে নাকি?

—আছে।

—শুনি।

—কলকাতার বাইরে যেতে হবে। কদিনের জন্য।

চকিতে মুখ ফেরায় সুনন্দা। গনগনে আঁচটা ফিকে হচ্ছে ধীরে ধীরে, বলে, বাইরে মানে?

—জলদাপাড়া। এবারের কাজটা একটু টাফ্। হাতির মাথা ডিঙিয়ে বাইক নিয়ে উড়ে যেতে হবে। প্রায় একশো গজ দূরে

গিয়ে বাইক আছড়ে পড়বে মাটিতে। খুব থ্রিলিং।

শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল সুনন্দা মাথা নীচু করে। সুমন তাগাদা দেয়, কিছু বলবে না।

—আচ্ছা সুমন, তুমি আর কোন কাজ যোগাড় করতে পার না? বেশতো নাটক করছিলে। আবার এই সব কেন?

—কিন্তু বদলে কত টাকা এনে দিচ্ছি তোমায়।

—আমায় নয়, বল তোমার খাজাঞ্চীগিরি করছি।

—একদম এসব কথা বলবে না। আমি তাই মনে করে তোমার হাতে টাকা দিই?

—কী জন্যে দাও?

—আমার অভিভাবক বলতে তো তুমিই।

—এটাও কী তোমার নতুন নাটকের ডায়লগ?

—অ্যায় সুনন্দা, ভালো হবে না কিন্তু।

—আমারও ভালো লাগে না।

—কী?

—তুমি খুব ভালো করেই জানো, দুজন অথর্ব মানুষকে নিয়ে আমায় সারাদিন থাকতে হয়। বাইরের জগৎটা যে কী সেটা ভুলেই গেছি, তারওপর—

তারওপর কী?

—তোমার দাদা। বাঁ হাতটা অকেজো হলে কী হবে, আজ কাছে যেতেই ডান হাত দিয়ে,

—কী?

—দেখো, বিশ্বাস না হলে।

গালটা বাড়িয়ে দেয় সুনন্দা। ঘরে নিয়ন জ্বলছিল। স্পষ্ট বোঝা যায় ফর্সা নিটোল মুখে এক চাপড়া লাল ফোলা ফোলা চিহ্ন।

—চড় মেরেছে? কেন?

—বোঝনা নাকি বুঝতে চাওনা?

চায়ে চুমুক দেওয়ার অবসরটুকু নিয়ে একসময় সুমন বলে, বুঝি বৌদি, বুঝি।

—না, বৌদি ফৌদি নয়।

—তুমি তো আমার বৌদিই।

—ওসব ছেঁদো কথা রাখ। ডাক্তার যেদিন শেষ জবাব দিয়ে গেছে সেদিন থেকেই তোমার বৌদি মরে গেছে।

—দাদা কিন্তু এখনও বেঁচে আছে।

—হ্যাঁ, প্রমাণটা এখনও গালে লেগে আছে।

—দাদার দিকটাও একবার বিচার করে দেখ। এই অল্প বয়েসেই তাকে সব কিছু ছেড়ে চলে যেতে হবে, এটা মেনে নিতে গিয়ে তাকে নিজের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করতে হচ্ছে। আর সন্দেহ নামের অনুভূতিটা বড় সর্বনেশে। একবার পেয়ে বসলে তাকে নামানো যায় না।

—যারা তোমার কাছে অভিনয় শেখে তাদেরকে লেকচারটা দিও, কিছু শিখতে পারবে।

—তুমি শিখবে না?

—আমি তোমার ছাত্রী নই। এবং অভিনেত্রী হবার কোন ইচ্ছেই আমার নেই। যাক আর কী বলতে চাইছ বলে ফেলো। সারাদিন দুজনের সেবা করতে করতে আমি টায়ার্ড। ঘুম পাচ্ছে।

—ঘুম পাচ্ছে বলে ছোট্ট খুকীর মতো শুয়ে পড়ব বললেই তো শোওয়া যাবে না। আমায় খেতে দেবে কে?

—যাও, অহনাকে ডেকে নিয়ে এসো।

—সে আর আসবে না।

—পাঁচ টাকার পুজো দিয়ে আসব মা বিপদতারিণীকে।

—শিক্ষিতা মেয়ে হ'য়ে তুমি বিপদতারিণী মানো?

—বিপদটা মানি।

—অহনা তোমার বিপদ?

—হ্যাঁ তাই।

—তুমি কী বলতে চাইছ বলতো?

—কিছু না। এখুনি খাবে না পরে?

—দুজনে একসঙ্গে খাব।

—কবে যাওয়া হচ্ছে? জলদাপাড়া না জঙ্গীপাড়া?

—জলদাপাড়া, সোমবার।

—কবে ফেরা হবে?

—দিন দুই তিন তো লাগবেই।

—যদি চারদিন হয় ফিরে এসে আমার মড়ামুখ দেখবে।

—প্লীজ সুনন্দা, ও কাজটা কোরনা, তাহলে আর আমার কেউ থাকবে না।

সেটা মনে থাকে যেন।

শব্দহীন গজগজানির রেশ নিয়ে সুনন্দা খাবারের জোগাড় করতে চলে যায়।

।। আট ।।

নিষিদ্ধ পল্লীতে ঢোকাটা যত সহজ বেরিয়ে আসাটা ঠিক ততটাই শক্ত। কিন্তু শিউলি একদিন বেরিয়ে আসতে পেরেছিল। আসলে তার বয়েসটাও হয়ে গিয়েছিল। সাধারণত ও পাড়ার মেয়েরা, যাদের একদা রমরাম বাজার ছিল, খানিকটা ইনফ্লুয়েন্স ছিল, তারাই শেষ পর্যন্ত মাসীতে পরিণত হয়। হয়তো শিউলিও একদিন মাসীটাসী হয়ে যেতো। কিন্তু হঠাৎ একদিন অহনাকে পেয়ে তার মনের গতি পাল্টাতে শুরু করেছিল। তারপর অবনী মোহনের সঙ্গে দেখা। দেহের ব্যবসাটা আরো কিছুদিন চালাবার পর একদিন পদ্মমাসীর কাছে গিয়ে বলেছিল এ লাইন সে ছেড়ে দিতে চায়। পদ্মমাসী মানুষটা আর পাঁচটা দজ্জাল মাসীর মত না। তার ওপর তারও তখন বয়েস প্রায় সত্তর। শিউলিকে সে বরাবরই একটু স্নেহের চোখে দেখতো। শিউলির কথা শুনে বুড়ি প্রায় আঁৎকে ওঠে বলেছিল, এ ভুল করিসনে শিউলি। আমার পরে এ জায়গাটা তো তোরই। মেয়েরা তোকে মান্যি করবে, ভয় পাবে। শিউলিকে কিন্তু টলানো যায়নি। অহনার কথা সব খুলে বলেছিল। তাতেও বুড়ি হেসে লুটোপুটি। হাসতে হাসতেই বলেছিল, আজ যার কথা ভেবে তুই লাইন ছাড়তে চাইছিস সেই মেয়েই একদিন তোর আসল পরিচয় পেয়ে তোকে ঘেন্না করবে। বেশ্যা বলে মুখে লাথি মেরে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেবে।

সে যা হবার হ'বে, বলে শিউলি সোনাগাছি ছেড়ে চলে এসেছিল ফুলবাগানের একতলা এক ভাড়া ঘরে। এর জন্যে বুড়ি পদ্মকে বেশ কিছু টাকাও দিতে হয়েছিল। নগরবধূর জীবনে সে রোজগারও অনেক করেছে। সেই জমানো মূলধনকে সম্বল

করে এক অনিশ্চিত জীবনে পা দিয়েছিল। নিজের ভরণপোষণ ছাড়াও তার বড় খরচ ছিল অহনার খরচ জোগানো। আসলে অবনীমোহনের সে রকম কোন অর্থবল ছিল না। এদিক ওদিক করে তাঁর যা রোজগার ছিল তা ঐ ঘর ভাড়া আর কোনমতে দুজনের পেট চালানোর মতো। কিন্তু একটি মেয়ের পড়ানোর খরচ, তার জামাকাপড় হাত খরচ খুব একটা কম কথা নয়। মাসে একদিন করে অবনীমোহন শিউলির বাড়ি যেতেন। খরচের টাকা নিয়ে আসতেন। আর প্রতিবারের মতো প্রতিবারই অবনীকে শিউলি বলে দিত তার কথা যেন অহনার কাছে একেবারেই প্রকাশ করা না হয়।

একতলা ঘরের ছোট্ট একফালি দাওয়ায় বসে শিউলি ভাবছিল নিজের ফেলে আসা জীবনের কথা, অহনার কথা, অবনীমোহনের কথা। প্রথমে তার রাগ হয়েছিল অবনীর ওপর। কেন তার কথা না শুনে মেয়ের কাছে তার জন্ম বৃত্তান্ত বলে দিয়েছিল। কিন্তু পরে শিউলি ভেবে দেখেছে একদিক থেকে অবনী ঠিক কাজই করেছেন। সত্যকে চিরজীবন চেপে রাখা যায় না। আর উচিত নয়। কিন্তু অবনীর কাছে যা শুনল তাতে ব্যাপারটা শিউলিকে ভাবাতে শুরু করে দিয়েছে। পেটে না ধরলেও ঐ মেয়ের মধ্যেই নিজের সুপ্ত মাতৃচেতনা সে ফিরে পেয়েছিল। আজ যদি ঝোঁকের মাথায় অহনা কোন ভুলপথ বেছে নেয় সেটা হবে তার কাছে ভয়ানক।

—আপনিই শিউলি মাসী?

চমকে ওঠে শিউলি। অহনা। ভাবতেও পারেনি অহনা হঠাৎ সশরীরে তার সামনে এসে দাঁড়াবে। তাড়াতাড়ি করে এগিয়ে যায় ওর দিকে।

—অহনা?

—আমায় চেনেন?

শিউলি ম্লান হাসে। তারপর আরো কাছে এগিয়ে বলে, হ্যাঁ মা, তোমায় চিনব না?

—আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

—নিশ্চই আছে। আগে ঘরে চল, তারপর সব হবে।

—হ্যাঁ, তাই চলুন। আমার সময় লাগবে।

শিউলি ওর হাত ধরতে গেলে অহনা ছাড়িয়ে নিতে নিতে বলে, অত অন্তরঙ্গতার কোন প্রয়োজন নেই। চলুন ভেতরে।

অতি মামুলি এক ফালি একখানা ঘর। আসবাব বলতে তেমন কিছুই নেই। একটা সাধারণ কাঠের তক্তা। তার ওপর সাধারণ একটা বিছানা। বালিশ। একদিকের দেওয়ালে একটা র‍্যাক। কয়েকটা স্টীলের বাসন। র‍্যাকের পাশেই সস্তা কাঠের একটা আলনা। কয়েকটা পরার কাপড় ঝুলছে। অন্যদিকের দেয়ালে রামকৃষ্ণের আর মা কালীর ছবি সমেত ক্যালেণ্ডার ঝুলছে। পুরনো সালের ক্যালেণ্ডার। বোঝা যায় ঐ কালীকেই শিউলি রোজ ধূপধুনো দেয়।

—আপনি এখানে একাই থাকেন ?

—হ্যাঁ মা একাই থাকি। আর কে থাকবে বলো ?

—আপনার চলে কী করে ?

—চলে যায়। আমার তো বিশেষ কোন খরচ নেই।

—কিন্তু আমি জেনে গেছি আপনার খরচ আছে। আমার প্রতিমাসের খরচ। যেটা এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন।

—বেশ। সবই যখন জেনেছ তখন এটা নিশ্চই মানবে এ খরচটা আমারই বহন করা উচিত।

—না। এটা আপনার করা উচিত হয়নি। আগাছাকে যত্ন করে কেউ টবে লাগায় না।

সামান্য সময় নীরব থেকে শিউলি বলে, একটা কথা তোমায় বলি মা, জন্ম তোমার যাই হোক, তাতে তোমার কোন হাত ছিল না। কিন্তু নিজেকে অপমান করার কি তোমার কোন অধিকার আছে ? এটা নিশ্চই জানো আত্মহত্যা করাটাও যেমন আইনের চোখে অপরাধ, নিজেকে অপমান করাটাও একটা অপরাধ। সত্যি করে বলতো অহনা, সত্যিই কী তুমি আগাছা ? সংসারের জঞ্জাল ? না অহনা, না। যদি তুমি অপরাধী হতে, খুনী হতে কিংবা কোন গরীবের সর্বনাশ করতে তাহলে বলতে পারতে তুমি সমাজের এক ঘৃন্য প্রাণী। কিন্তু তুমি তো এসবের কিছু নও। তুমি একটা সৎ, সুন্দর আর পবিত্র মেয়ে। পাঁক থেকে পদ্মফুল জন্মায় তাই বলে কেউ কী পদ্মফুল হাতে তুলে নেয় না ? নাকি তা দেবতার পায়ে জায়গা পায় না ?

—এ সব জ্ঞানের কথা আমি অনেক পড়েছি, শুনেওছি।

আবার মৃদু হাসে শিউলি। তারপর বলে, পড়েছ। কিন্তু মানে না বুঝেই পড়েছ। সেগুলো মনে রাখতে পারনি।

আচ্ছা আপনি তো সারাজীবন অসৎ পথে রোজগার করেছেন, আপনার মনে তার জন্যে কোন জ্বালা নেই ?

—এটাই তোমার ভুল অহনা। আমি মনে করিনা কোন অসৎ পথে রোজগার করেছি। কাউকে ঠকিয়ে একপয়সাও নিইনি। আমার দেহ ছাড়া আর অন্য কোন মূলধন ছিল না। লোকে মূলধন খাটিয়ে ব্যবসা করে, সংসার চালায়। আমার মূলধন খাটিয়ে আমি আমার পেটের খিদে মিটিয়েছি। এটা অসৎপথের রোজগার নয়। তার জন্যে আমার কোন জ্বালাও নেই।

—আপনি বলেই এসব কথা বলতে পারছেন। কোন বারবনিতাই নিজের পেশাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে না।

—সেটা অন্য কারণ। হয়ত সেই কারণেই আমি আমার পেশা ছেড়ে দিয়েছি।

—আপনার পেশা ছাড়ার কারণ কী তা নিয়ে আমার গবেষণার প্রয়োজনও নেই তবে আপনার কাছে আমার প্রশ্ন কেন আমায় আঁস্তাকুড় থেকে তুলে এনে বাঁচিয়েছেন ?

—তুমি কী মনে করো বেশ্যার কোন হৃদয় বলে কিছু নেই ?

—কিন্তু আপনার হৃদয়ের আবেগে আর একজন কেন জ্বলে-পুড়ে মরবে ?

—এটা তোমার নিজের তৈরী করা দুঃখ। আর এটাকে বাড়তে দিলে কষ্টটা তোমার আরো বেড়ে যাবে। সত্যটাকে সহজভাবে নাও অহনা।

অহনা ক্রমশই অধৈর্য্য হয়ে পড়েছিল। সেই একই জ্ঞানের কথা তার একেবারেই ভালো লাগছিল না। আসলে সে এসেছিল অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে। সেই প্রসঙ্গে যেতে গিয়ে ও বলল, জীবনে সব সত্যকে সহজভাবে নেওয়া যায় না। এখন আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিনতো, যে লোকটি আমাকে আঁস্তাকুড় থেকে কুড়িয়ে পেয়েছিল, সে কে ? কোথায় থাকে ? তাকে আপনি চেনেন ?

—হ্যাঁ চিনি।

—তার নাম শম্ভু দালাল ?

—তার পদবী দালাল কিনা জানি না। সবাই তাকে ঐ নামেই ডাকতো।

—আমি একদিন ভেবেছিলাম তার খোঁজে ঐ পাড়ায় যাব।

আঁৎকে ওঠে শিউলি, বলে, কী সর্বনাশ। তুমি যাবে ঐ পাড়ায় ? তাকে খুঁজতে ?

—হ্যাঁ। তাকে আমায় খুঁজে পেতেই হবে। বলুন আপনি জানেন কিনা তার হোয়ার অ্যাবাউটস্ ?

—না মা, শম্ভু এখন কোথায় থাকে আমি জানি না। ও পাড়ার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ অনেকদিনই ঘুচে গেছে। তাছাড়া আমি জানিও না শম্ভু এখনও দালালি করে কিনা।

—ওয়েল ! তাহলে আমাকেই তাকে খুঁজে বার করতে হবে।

আবারও শিউরে ওঠে শিউলি। ত্রস্ত চোখে অহনার দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি সত্যি সত্যি ওই খারাপ জায়গায় যাবে নাকি ?

—যেতেই হবে।

—না, এবার রীতিমত ধমকের সুর শিউলির কণ্ঠে, কোনমতেই কোন অবস্থাতেই তোমার ও পাড়ায় যাওয়া চলবে না। একটা ছোট্ট গাছ আমি টবে পুঁতেছিলাম। তাতে একটাই ফুটফুটে ফুল ফুটেছে। কেউ তাকে ছিঁড়ে নষ্ট করবে তা হতে দিতে পারি না। মনে রেখো সমাজে তোমার পরিচয় তুমি বিখ্যাত এক রাজনৈতিক যোদ্ধা অবনীমোহন রায়ের মেয়ে। ও পাড়ায় কোন ভদ্রলোকের মেয়ে যায় না। তাছাড়া শম্ভুকে খুঁজে পেয়ে তোমার লাভটাই বা কী ?

—আমার অরিজিন্যাল বাবা মাকে আমি খুঁজে পাবার চেষ্টা করতে চাই।

—তুমি কী মনে কর, সত্যিই যদি কোনদিন শম্ভুকে খুঁজে পাওয়া যায়, সে মনে রেখেছে বাইশ তেইশ বছর আগে এক কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে যাকে সে আমার হাতে তুলে দিয়েছিল ?

—মনে থাকতেও পারে। রোজ রোজ কী এরকম কুড়িয়ে পাওয়া বেওয়ারিশ ছেলে মেয়ে তার হাতে আসত ? এনিওয়ে, আজ আমি যাচ্ছি। তবে শম্ভু দালালকে আমি যেমন করে পারি

খুঁজে বার করবই।

অহনা এতক্ষণ শিউলির বিছানায় বসেছিল। ও উঠে পড়ে, দরজার দিকে পা বাড়াতে চায়। নিমেষের মধ্যে শিউলিও উঠে ওর পথ আটকায়, আমায় কয়েকটা দিন সময় দাও অহনা। একমাত্র আমিই হয়তো পারব শম্ভুকে খুঁজে বার করতে। কিন্তু আমার হাত ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর, জীবনে আর কোনদিনও, ভুল করেও ঐ নরকে পা দেবে না!

—ছোঁয়াছুঁয়ির কোন প্রতিজ্ঞায় আমার কোন বিশ্বাস নেই। ঠিক আছে, কিন্তু আনলিমিটেড সময় তো আমি আপনাকে দিতে পারি না।

—না, খুব বেশী সময় আমি নোবও না। তুমি ঠিক এক সপ্তাহ পরে আমার কাছে এসো।

—বেশ, তাই হবে।

অহনা বেরিয়ে যাচ্ছিল। এবার একেবারে দরজা আগলে দাঁড়ায় শিউলি, কারো বাড়ি প্রথম এলে তাকে একটু মিষ্টি মুখ করে যেতেই হয়। তাছাড়া, আমরা যারা বেশ্যা, তারা তো কখনোই কোন অতিথিকে বিমুখ করি না। সেই রকমই মনে করো, এক বেশ্যা তার অতিথিকে সামান্য কিছু মিষ্টি মুখ না করলে তার জাতধর্ম থাকবে না।

—কিন্তু আমি তো মিষ্টি খাইনা।

—এই বয়েসে মিষ্টি খেলে শরীরের কোন ক্ষতি হয় না। তুমি বোস। পাশেই মিষ্টির দোকান। আমাকে না বলে এ বাড়ি থেকে তুমি চলে যাবে না। মাসী বলে ডেকেছ, তার মনে দুঃখ দিও না।

অগত্যা অহনাকে বসতেই হল। শিউলি চলে গেল খাবার আনতে।

মিষ্টি আর নোনতা খেয়েই অহনা উঠে পড়ে। তারপর নিজেই শিউলির কাছে এগিয়ে এসে বলে, মাসী বলে ডাকলেও, আমি জানি আপনি আমাকে মেয়ের মতোই মনে করেন। আপনার কাছে অনুরোধ, এই মেয়েটাকে যদি বাঁচাতে চান তাহলে শম্ভুকে সত্যিসত্যিই খুঁজে বার করুন। আর সেটা একমাত্র আপনিই পারেন।

অহনা চলে যাচ্ছিল। শিউলি পিছু ডাকে, সুমন ছেলেটা কেমন অহনা?

তীর্যক দৃষ্টিতে একবার শিউলির দিকে তাকিয়ে অহনা বলে, তাকে আর আমার প্রয়োজন নেই। তাই আপনার এ প্রশ্ন অবান্তর।

অহনা দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় না করেই বেরিয়ে যায়। শিউলি দাঁড়িয়ে থাকে স্থানুর মতো।

।। নয় ।।

পাহাড়ে বা জঙ্গলে বাইক চালিয়ে শট্ দেওয়া যে এত পরিশ্রম সাধ্য সেটা বাইরে থেকে বোঝা যায় না। কস্তুরী বলেছিলেন এবারের শ্যুটিং বেশ টাফ্। সেটা হাড়ে হাড়ে সুমন বুঝেছে আজ সারা দিনে। নিতাইয়ের বাইক নিয়ে হাত পাকিয়ে শহরে গাড়ি চালানো এক জিনিষ আর এবড়ো খেবড়ো জঙ্গুলে পথে বাইক চালানো শুধু পরিশ্রম নয় রিস্কিও বটে। এক্ষেত্রে ডামি ব্যবহার করা যাবে না। ডাইরেক্ট শট্। এবং সবটাই প্রায় মিড্ ক্লোজ থেকে ফ্রণ্ট ভিউ। ফলে সুমনকেই সমানে বাইক চালাতে হয়েছে আর বারবারই বে-ট্রাক হয়ে গিয়ে শট্ এনজি হয়েছে। মাঝে কিছুক্ষণ বৃষ্টি হয়ে গেছিল। পাহাড়ি বৃষ্টি। এই থামে এই যায়। কিন্তু নতুন করে আরম্ভ করতে গিয়ে পিছিল রাস্তায় বেশ কয়েকবার আছাড় খেয়েছিল। আবার ড্রেস চেঞ্জ, আবার মেকআপ ঠিক করা। অবশেষে শ্যুটিং প্যাকআপ যখন হ'ল তখন সূর্যদেবের বিদায় নেবার পালা শুরু হয়ে গেছে।

একটা বাংলো নেওয়া হয়েছিল। পর পর কয়েকটা কটেজ। সুমন নিজের কটেজে ফিরে টান টান শরীর ফেলে দিল ডাবলোপিলোর খাটে। ক্লান্তিতে ওর শরীরটা বিশ্রাম চাইছিল। চোখের পাতা দুটো এক করতে বেশ ভালো লাগছিল।

আর, আশ্চর্যের ব্যাপার হল, এত ক্লান্তির পর ওর বুজনো চোখের পর্দায় যে মুখটা প্রথম ভেসে উঠল সেটা সুনন্দার। চব্বিশ বছরের ভরন্ত যৌবনের রক্তিম আঁচে তাতানো মুখ। এ সংসারে কদিনই বা সে এসেছে। বছর চারেক। তখনও দাদার স্বাস্থ্য ছিল। ছিল ভরা যৌবনের উদ্দাম। সুমনের খুব আনন্দ

হয়েছিল বিয়ের দিন দাদা বৌদিকে দেখে। বাবা মারা যাবার পর দাদাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছিল। বাবার চাকরিটা ও পেয়েছিল। কিন্তু উচ্চাকাঙ্খী দাদা নীচু পোস্ট থেকে আরো উঁচুতে যাবার জন্যে হায়ার স্টাডি শুরু করল। সারাদিন ফ্যাক্টরির কাজ তারপর রাতদুপুর পর্যন্ত পড়াশুনো। কিন্তু ভেতরে ভেতরে কখন যে দম ফুরিয়ে আসছিল দাদার সেদিকে ভ্রুক্ষেপই ছিল না। বিয়ের পর মাত্র বছর চারেকও কাটাতে পারেনি। হঠাৎই একদিন ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে করতে বুকের বাঁদিকে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে সেখানেই শুয়ে পড়েছিল। ম্যাসিভ অ্যাটাক। তারপর, ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট। সুমনের আজও মনে আছে সে কী চরম বিপর্যয়ের দিন। তখন একদিকে ওর 'শরশয্যায় ভীষ্ম'র রিহার্সাল চলছে পুরোদমে। নিজেরই তৈরী করা নিয়মের জালে নিজেই আটকে গেছে। কোনমতেই রিহার্সাল কামাই কবা যাবে না। অন্যদিকে দাদাকে নিয়ে যমে মানুষে টানাটানি। প্রায় বাহাত্তর ঘণ্টা যমরাজ আধিপত্য চালাবার পর সে যাত্রায় হার মেনে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু সে আশার আলো মাত্র কদিনের। সুস্থ হয়ে তিনমাস ফ্যাক্টরি অ্যাটেণ্ড করার পরই আবার অ্যাটাক। এবারও বাঁচার আশা ছিল না। কিন্তু বেঁচে ফিরেছিল দাদা। অথর্ব হয়ে। হ্যাঁ, শরীরের একটা দিক তখন ক্রমাগত অবশ হয়ে আসছিল। ফ্যাক্টরি যাওয়া বন্ধ। জমানো টাকায় হাত পড়ে গেছে। আর কোনদিন বিছানা ছেড়ে সুস্হ হয়ে কর্মস্হলে যাওয়ার আশাও প্রায় অনিশ্চিত।

তারপর, তিন চার পাঁচ ছয় হসপিট্যাল যাওয়া আর আসা। এবং শেষবারে ডাক্তার জানিয়ে দিয়েছিলেন, ভদ্রলোকের বেঁচে থাকাটাই আশ্চর্যের। হয়তো ঐ ভাবে শুয়ে থাকতে থাকতেই একদিন শেষ ষাঁরের মতো দমটা নিঃশেষ হয়ে যাবে।

মায়ের মাথার গণ্ডগোল আগে থেকেই অল্প বিস্তর ছিল। দাদার খবর শোনার পর হঠাৎই কেমন যেন বোবা পাগলে পরিণত হয়ে গেলেন। আর সুনন্দার মুখে, মনে হয়েছিল কে যেন এক দোয়াত কালি ফেলে দিয়েছিল।

সেদিনই সুমন ঠিক করে নিয়েছিল, দাদা চলে গেলে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তার বিয়ে দেবে।

কিন্তু, সুনন্দা এ কী করে বসে আছে ? ও তো তার প্রেমে পড়ে গেছে। দাদার মৃত্যু ওকে আজ কতটা ধাক্কা দেবে কে জানে। কিতু সুমনের প্রত্যাখানে ও ভেঙ্গে যাবে এটা আজ নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

তবু, সেটা কী ঠিক কাজ হবে ? বৌদি দেওয়ের বিয়ে বা ভালবাসা জগৎ সংসারে কোন নতুন ঘটনা নয়। আর সুনন্দা ফেলে দেবার মেয়েও নয়। কদিন হয়তো প্রতিবেশীদের মধ্যে কিছু গুঞ্জন উঠবে। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না।

কিন্তু অহনা ? সে এখনও জানে না হঠাৎ অহনার জীবনে এমন কী ঘটল যাতে করে সে পুরনো সব প্রতিজ্ঞা আর স্মৃতি ভুলে গিয়ে ঐ ধরণের ব্যবহার করতে পারে ? এমন কী ঐ ঘটনার পর থেকে অহনার সঙ্গে তার একদিনের চোখের দেখাও ঘটেনি। যতবারই ওদের বাড়ির দিকে তাকিয়েছে ততবারই দেখেছে বন্ধ দরজা আর জানলা। আগে সুনন্দার কাছে অহনার অনেক কথা বলেছে কিন্তু এখন সুনন্দা অহনার ব্যাপারে সম্ভবত জেলাস এবং ননইণ্টারেস্টেড। এর কারণটা স্পষ্ট।

সুমনের সব জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। সুনন্দা তার সম্পর্কে বৌদি হলেও সুনন্দার ভবিষ্যৎ তার ভাবনায় রয়ে গেছে। দুম্ করে তাকে রাস্তায় বসিয়ে দিতে পারে না। তার ভালবাসাকে পাশ কাটাতে পারে। কিন্তু অবজ্ঞা করার নিষ্ঠুরতা তার মধ্যে নেই। আর অহনা ? সেই কবে ছোট বেলার প্রেম। যে প্রেম মনের গণ্ডী পার হয়ে দেহজ সুখে সুখী হয়েছিল। স্মৃতি হলেও এখনও তা জাগ্রত। আজ যদি সুনন্দার দিকে তাকাতে যায় অহনার কী হবে ? আবার অহনা নিজের ভুল বুঝতে পেরে ফিরে এলে সুনন্দা যে বাঁচার সব রসদ হারিয়ে ফেলবে।

—সুমন কী ঘুমিয়ে পড়লে ?

চোখ খুলতেই দেখে সামান্য একটা সিল্ক নাইটির আশ্রয় নিয়ে কস্তুরী এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। হাতে দু গ্লাস হুইস্কী।

চকিতে উঠে বসে সুমন।

আলো আঁধারির ঘেরাটোপে রহস্যময় কটেজ। চারিদিকে অসম্ভব শান্ত বুনো পৃথিবী। রোমাঞ্চকর পারফিউমের গন্ধে

আমোদিত ঘর। কস্তুরী সান্যালের বিলাসীতা। দামী পারফিউম ছাড়া উনি মাখতে পারেন না।

—নাও, ধরো, ডানহাতে ধরা পরিপূর্ণ পেগটা এগিয়ে ধরেন সুমনের দিকে।

সুমন যে কোনদিনও মদ খায়নি তা নয়। দিশি, তাড়ি সবই ওর টেষ্ট করা আছে। এগুলো কোন দোষের মধ্যে পড়ে না এটাই ওর বিশ্বাস। আজ তবুও একটু ইতস্তত করে। কস্তুরী সান্যাল একে বয়েসে বড় তদুপরি শোভন অশোভনের প্রশ্নে ও সামান্য বিব্রত বোধ করে।

—কী ভাবছ কী? ধরো। ইট ইজ হাই টাইম টু শিপ্ দ্য লাইফ। অ্যাণ্ড হুইস্কি কুড্ ব্রিং দ্য লাইফ। ডোণ্ট ওয়েস্ট য়োর টাইম।

ধীরে ধীরে হাত বাড়িয়ে হুইস্কির পেগটা অ্যাকসেপ্ট করে নেয়।

—দ্যাট্‌স্ লাইক আ গুড বয়।

নিজের পেগে শিপ করতে করতে বিছানার অবশিষ্ট এবং অপরিসর স্থানটি দখল করে নেন কস্তুরী। আর কিছু না ভেবে সুমন এক চুমুকে সমস্ত পেগটাই গলায় ঢেলে দিয়ে আড় চোখে একবার কস্তুরীর দিকে তাকায়। ঘরের মধ্যে মায়াবী আলো, নাম না জানা মন পাগল করা পারফিউমের উগ্র গন্ধ আর সামান্য পৃথুলা হলেও ঠিক যে যে শারীরীক বৈশিষ্ট থাকলে রমনী পুরুষের চোখে মদিরতা ছড়াতে পারে তার সবটাই কস্তুরীতে বর্তমান।

এক চুমুকে সুমনের পেগ শেষ করা দেখে কস্তুরী যেন আনন্দে লাফিয়ে ওঠেন।

সুমনের বেশ আশ্চর্য লাগে। এ কস্তুরী, কস্তুরী অ্যাড্ এজেন্সীর কস্তুরী সান্যাল নয়। কেমন যেন প্রগলভা। কলবলে গলায় কস্তুরী তখন বলছেন, মাই গড, তুমি তো ওস্তাদ লোক। মিঃ সান্যালের ঐটুকু সিপ্ করতে সারা সন্ধ্যে লেগে যেতো।

অন্য প্রসঙ্গ পেয়ে সুমন জিজ্ঞাসা করে, মিঃ সান্যাল তো এলেন না?

খিলখিল করে হেসে কুটোকুটি হয়ে যান কস্তুরী, মিঃ সান্যাল? দ্যাট ওল্ড্ হ্যাগার্ড? সে আসবে আমাকে সঙ্গ দিতে? বাট হোয়াট হি হ্যাজ টু গিভ্ মী? মানি? ইয়েস দ্যাট্ ওনলি থিং হি প্রিজার্ভস্ ইন হিজ ভল্ট্। বাট নাথিং এল্স্ হুইচ এ গার্ল এক্সপেক্টস্ ফ্রম আ ম্যান।

—এসব আপনি কী বলছেন কস্তুরিদি?

—নো কস্তুরিদি। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু হিয়ার দ্যাট অব্-নক্সাস টার্ম, দি-দি···আই ডোণ্ট লাইক টু বী ইওর দিদি···

সুমন বুঝতে পারে কস্তুরি সান্যাল এখন খুব হাই।

—ওহ্? আয়াম স্যারি, ইউ নীড্ মোর ড্রিংকস্। ওয়েট আ বীট্।

প্রায় টলায়মান পদক্ষেপে কস্তুরী সান্যাল ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান। সুমন বুঝতে পারে না তার এখন কী করা উচিত। মহিলাকে এমন অবস্থায় কোনদিন সে দেখেও নি। উনি চাচ্ছেনই বা কী? লোকমুখে ওঁর সম্বন্ধে কিছু এলোমেলো খবর ও শুনেছে। ওঁর স্বামী মিঃ সান্যালের সঙ্গে একটা নেতিবাচক সম্পর্ক তৈরী হয়ে আছে অনেকদিনই। একই বাড়িতে থেকেও দুজন দুটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। এতোদিন ধরে কস্তুরী সান্যালের সল্টলেকের বাড়িতে যাতায়াত করে মাত্র একদিনের জন্যে ভদ্রলোকের দেখা পেয়েছে। তাও সামান্য দূর থেকে। মাঝারি মাপের সাধারণ চেহারার সফল ব্যবসায়ী। ভদ্রলোকের বয়েস প্রায় ষাটের কাছে। সেদিনই মনে একটু খট্কা লেগেছিল। কারণ কস্তুরী সান্যালের সঙ্গে কিছু না হলেও বছর কুড়ির ডিফারেন্স। তাছাড়া কস্তুরীর মতো সুন্দরী, শিক্ষিতা এবং হাই সোসাইটিতে ঘোরাফেরা করা মহিলার সঙ্গে ভদ্রলোক প্রায় বেমানান। নিতান্তই পারিবারিক ব্যাপার বলে সুমনও ও ব্যাপারে কোন ইণ্টারেস্ট দেখায়নি। কিন্তু একটু আগের কস্তুরী সান্যালের সঙ্গে আগের কস্তুরীকে সে মেলাতে পারছিল না।

—থিংকিং অ্যালাউড? কি বিড় বিড় করছ সুমন?

মুখ ফিরিয়ে দেখে কস্তুরী ফিরে এসেছেন। হাতে স্কচের বোতল। আগের জায়গায় বসতে বসতে নিজের হাতে সুমনের গ্লাসে বেশ খানিকটা বেহিসাবী পানীয় ঢেলে বললেন, দেখি তুমি

কতটা খাইয়ে।

—কিন্তু কস্তুরীদি।

—ইউ নটি। এগেন কস্তুরীদি?

—না মানে, বলছিলাম কী। আমি খুব একটা হ্যাবিচুয়াল নই। কালেভদ্রে কখনোসখনো।

—সো হোয়াট? এটা তো কোন চ্যালেঞ্জের ব্যাপার নয়। যতটা পারবে খাবে।

মদ তার নিজস্ব প্রভাবে মাথার মধ্যে ডুগডুগি বাজায়। সাধারণ সুস্থতাগুলো ধীরে ধীরে লুপ্ত হতে থাকে। তারপর এক সময় সুপ্ত বাসনাগুলো গ্যাঁজলার মতো ওপর দিকে ঠেলে উঠে আসে। একসময় দেখা গেল কস্তুরী সান্যালের বাহুডোরে আটকা পড়েছে সুমন। নেশা তার মাথাতেও অলৌকিক স্বপ্নের জাল বিস্তার করে ফেলেছিল। সুমন ভুলে গেল কস্তুরী সান্যালের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা। আসলে তার যৌবন তখন উত্তপ্ত এবং আবেগময়ী নারী দেহের অঙ্গাঙ্গী সংস্পর্শে লুপ্ত-চেতন। দুজনেরই শরীর থেকে তখন বস্ত্র উধাও।

কস্তুরীর কণ্ঠে মদালস ডায়লগ। সুমনের ঠোঁটের ওপর নিজের ঠোঁট ছোঁয়াতে ছোঁয়াতে আলতো বিবশ স্বরে বলছেন, সুমন—,

সুমনের হাত দুটো তখন কস্তুরী সান্যালের দেহের ভাঁজ প্রতি-ভাঁজে রোমাঞ্চিত খেলায় ব্যস্ত। কোনমতে সে বলতে পারে, উঁ—,

—সুমন, আই লাভ ইউ সুমন।

—বাট ইউ হ্যাভ য়োর হাজব্যাণ্ড। তিনি জানতে পারলে কী হবে?

—আই হেট হিম লাইক এনিথিং। কেন জান?

—কেন?

—লোকটা শুধু টাকা রোজগার করতে শিখেছে। কিন্তু জানে না কী ভাবে স্ত্রীর মন জয় করা যায়। তার ওপর, হি ইজ অ্যান ওল্ড হ্যাগার্ড। সুমন, তুমি বিশ্বাস করো কতদিন কত রাত একা বিছানায় শুয়ে আমাকে কাঁদতে হয়েছে। ডু ইউ নো হোয়াই?

সুমন জানে কারণটা কী। কিন্তু তার উত্তর দেবার কোন

অবসর ছিল না। এর আগে এমন করে এই রকম নিভৃত পরিবেশে নারী দেহের গভীর স্বাদ পায়নি। অহনাকে সে পেয়েছিল। একা, নির্জন ঘরে। তাকেও গভীর আশ্লেষে উপভোগ করেছে। কিন্তু সেখানে একদিকে ছিল ভয়। অন্যদিকে উভয় পক্ষের অপটুত্ব এবং অহনার 'লক্ষ্মীটি সুমন, আর না, এবার ছাড়ো, বাবি এসে পড়তে পারে', ইত্যাদি আনরোম্যান্টিক ডায়লগের বন্যা। কিন্তু কস্তুরী সান্যাল? কে বলবে উনি চল্লিশের ঘরে। শরীর যেন নিটোল অথচ সামান্য মেদজ মাংসের উত্তপ্ত কামনা সাগর। ভরন্ত বক্ষযুগলে নেই শৈথিল্যের অভিশাপ। গুরু নিতম্বে হস্ত সঞ্চালন করতে করতে তার মনে হয় পৃথিবীর সব মেয়ে কেন এমন শরীর নিয়ে জন্মায় না। সে আরো গভীর আবেগে প্রায় পাগলের মতো কস্তুরী দেহ নিষ্পেষিত করতে করতে বলে, হোয়াই, হোয়াই কস্তুরী, আপনাকে কাঁদতে হয় কেন?

—ইউ ফুল। তুমি জান না, মধ্য যৌবনে একটি মেয়ে কী চায়? সেক্স। হ্যাঁ সেক্স। সেক্স ছাড়া কারোরই জীবন পূর্ণ হয় না। কি মেয়ে, কি ছেলে।

—কিন্তু ভালোবাসা?

—এই তুমি নাট্যকার? তুমি তো আমার ঐ বুড়ো, সেক্সুয়ালি ক্রীপ্‌লড্ হাজব্যান্ডটির মতো কথা বললে। সেও বলে, যে সত্যিকারের ভালোবাসে সে সেক্সের জন্যে পাগল হয় না। আসলে ইমপোটেন্ট্ লোকেরা নিজেদের অক্ষমতা ঢাকার জন্যে ঐ সব গাল-গপ্পো তৈরী করে মেয়েদের ভুলিয়ে রাখতে চায়। এও এক ধরনের হিপোক্রিসি। অ্যান্ড আই হেট দোজ হিপোক্রিট্‌স্।

হঠাৎ সুমনের কী মনে হল, ও বলে, আর এই মুহূর্তে আমি যদি পাপ অপাপ অথবা ন্যায় অন্যায়ের যুক্তি দেখিয়ে আপনাকে ছেড়ে চলে যাই।

—আই উইল শ্যুট্ ইউ। তুমি জানো না, আমার কাছে একটা লোডেড রিভলবার থাকে। লাইসেন্সড্।

—অর্থাৎ আপনাকে স্যাটিসফাই না করলে আপনি আমায় খুন করবেন?

—তোমাকে তো আমি একদিন বলেছি, আমি যা চাই তা না

পাওয়া পর্যন্ত থামি না।

—তার মানে আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কেবল দেহের জন্যে ?

—নো। আই বিলিভ, দেহ ছাড়া প্রেম বেশীদিন লাস্ট করে না। আবার প্রেমহীন দেহ সম্ভোগ, সেটাও বেশীদিনের না। আর, মদের নেশায় বলছি না, বিলিভ মী, আই লাভ ইউ। তুমি যদি কোনদিন আমায় ছেড়ে চলে যাও, আই শ্যাল কীল ইউ। আমার ভালবাসা এবং ভালবাসার মানুষকে আমি হারাতে অভ্যস্ত নই।

—তাহলে আমাকে ডেকে আনার উদ্দেশ্য ঐ একটাই ?

—না সুমন, হঠাৎ গভীর আবেগে নিজের ঠোঁট চেপে ধরে সুমনের ঠোঁটে। দীর্ঘস্থায়ী চুম্বন দিয়ে ঠোঁট তুলতে তুলতে বলে, তাহলে সত্যি কথাই বলি, স্টেজে তোমায় দেখে আমার দারুণ ভালো লেগেছিল। তোমাকে ডেকে আনার দুটো উদ্দেশ্য, তোমাকে সর্ব অর্থে আমার জীবনে এবং ব্যবসায়ে বেঁধে ফেলা।

—তাহলে, বড় ছবিতে অভিনয়টা আমার স্বপ্নই থেকে যাবে।

—ইউ ফুল। বেশ রাগত স্বরে কস্তুরী বলেন, কস্তুরী হিপোক্রিট নয়। মিথ্যে আশা সে কাউকে দেয় না। অলরেডি দুজন প্রোডিউসারের সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে। তারা তোমার ছবি দেখেছে, স্টিল অ্যান্ড মুভি। নেক্সট ছবিতে তুমি দুটো ছবিরই হিরো হচ্ছ। কলিকাতায় ফিরেই কনট্র্যাক্ট ফর্মে সই করবে।

—ওহ্, কস্তুরী, ইজ দিস ফ্যাক্ট ?

—সুমন, কস্তুরী সান্যাল, দিতেও জানে, নিতেও জানে। নাউ লেট আস এনজয় আওয়ার লাভ মেকিং। আই ওয়াণ্ট টু গেট মাই ফুল এনজয়মেণ্ট ফ্রম ইওর সাইড।

তারপর একসময় আরো গভীর রাতে কস্তুরীর কণ্ঠে একটি বাক্যই নির্গত হয়, সুমন, কথা দাও, আমাকে ছেড়ে কোনদিনও কোথাও যাবে না।

সুমন কি বলে বোঝা যায় না। তবে তখন তার মস্তিষ্কের কোন কোষেই না অহনা, না সুনন্দা, কেউ নেই, কস্তুরীর মিলন সঞ্জাত সুখানুভূতি ছাড়া।

দশ

অনাস্বাদিতপূর্ব অভিজ্ঞতা। বয়েসে অনেকটা বড়ো হওয়া সত্ত্বেও সুমন কিন্তু কস্তুরী মায়ায় আটকে গেল। পরের দু এক-দিন কয়েকটা প্যাচ ওয়ার্ক ছিল। সেগুলো শেষ হয়ে যাবার পর পুরো টিম কলকাতায় ফিরে এলো বিজ্ঞাপনটা রেডি করার জন্যে। কস্তুরী আর সুমন কিন্তু রয়ে গেল আরো কদিন। আর ঐ কদিনে নতুন দম্পতির মতো দুজনেই হনিমুন নেশায় মেতে উঠল। একজনের হঠাৎ পাওয়ার নেশা অন্যজনের দীর্ঘ অপ্রাপ্তির প্রাপ্তি-পুলক। কিন্তু হঠাৎই এক ভয়ঙ্কর এসটিডি সংবাদে সুমনের হল স্বপ্নভঙ্গ। কলকাতা থেকে কস্তুরী প্রোডাক-শনের ম্যানেজার ফোন করেছিলেন, সুমনের দাদা আর নেই। তাই সুমনের তখনই ফেরা দরকার। এসটিডি রিসিভ করেছিলেন কস্তুরীই। সংবাদটা সঙ্গে সঙ্গে দেবার ইচ্ছে তার ছিল না। কিন্তু ব্যাপারটা হঠকারিতার পর্যায়ে চলে যায়। ফোন রেখেই কস্তুরী বলেন, এখুনি আমাদের কলকাতা ফিরতে হবে সুমন।

—কিন্তু তুমি যে বললে আরো কদিন থাকবে। আমার এখন তোমাকে ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না ডার্লিং।

কস্তুরীদি থেকে কস্তুরী এবং আপনি থেকে তুমিতে পেঁছতে বেশী সময় লাগে না সদ্য প্রেমে পড়া দুটি নরনারীর।

কস্তুরী বলেন, জানি সুমন, ইউ আর ডিপলি ইন লাভ উইথ মী। বাট্ দ্যা ক্রুয়েল ফ্যাক্ট···তোমার দাদা আজ সকালেই মারা গেছেন এবং—,

এক নিমেষে স্বপ্নের মিনার ভেঙ্গে সুমন আছড়ে পড়ল মাটির পৃথিবীতে। মুহূর্তে দাদা নয়, মনে পড়ল সুনন্দার মুখ। সে এখন কী করছে ? খুব কাঁদছে ? নাকি সুমনের ফেরার প্রত্যাশায় দিশেহারা।

অভিব্যক্তি চাপা দিয়ে সে বলল, জানতাম। ডাক্তার তো জবাব দিয়েই গিয়েছিলেন। বৌদি বেচারী বড় একা হয়ে গেল।

—আর তোমার মা ?

—থাকা না থাকা সমান। ওঁর কোন জাগতিক জ্ঞান-ট্যান নেই। অনুভূতিগুলোও সব ক্রীপ্‌ল্‌ড্‌ হয়ে যাচ্ছে। চট্‌ করে মরবেন না। অনুভূতিহীন মানুষ অনেক দিন বাঁচে।

—বৌদির বয়েস কত ?

—বেশী নয়। আমার থেকেও ছোট। বছর তেইশ চব্বিশ হবে।

—আনলাকি গাই। দেখো, মেয়েটি আবার তোমার বার্ডন্‌ না হয়ে যায়।

—আমি ঠিক করে রেখেছি।

—কী ?

—দাদার অফিসে যদি একটা চাকরি হয়ে যায় তো খুব ভালো। কিছু কিছু কোম্পানী এখনও ঐ প্রবেশানটা চালু রেখেছে। তারপর একটা ভালো ছেলে দেখে বৌদির আবার বিয়ে দিয়ে দোব।

—গুড ডিসিশান। বাট, তোমার মা ?

—আমার যদি রোজগার টোজগার মোটামুটি একটা জায়গায় আসে তাহলে কোন নার্সিং হোমে—,

—নো ম্যাটার। টাকাকড়ির জন্য তোমায় কোন চিন্তা করতে হবে না। টিল্‌ আই অ্যাম দেয়ার।

—কস্তুরী।

—হ্যাঁ বলো।

—সত্যিই তুমি আমার সঙ্গে সারা জীবন থাকবে ?

—তোমার কী মনে হয় ?

—মেয়েদের আমি ঠিক বুঝি না।

—এমন কোন অভিজ্ঞতা এর আগে হয়েছে ?

হঠাৎ সুমন থম্‌ মেরে চুপ করে যায়। মনে পড়ে যায় অহনার কথা। অহনাকৃত অপমানের কথা।

—বললে না তো ?

—হ্যাঁ কস্তুরী। আমার প্রথম জীবনে, তখন আর কতই বা বয়েস, একটি মেয়ে এসেছিল আমার জীবনে।

—আসতেই পারে। ছেলে মেয়ের জীবনে মেয়ে এবং ছেলে আসবে না এ সব কথা ভাবাই বাতুলতা। ইন্‌ভল্‌ভ্‌মেণ্ট কতটা ছিল ?

—সব শেষ হয়ে গেছে।

—কেন ?

—হয়তো বাল্য প্রেমের রোমান্স কেটে গেছে।

—এমনিই হয়। আমারো হয়েছিল। তেরো বছর বয়েসে, আমায় দেখলে মনে হ'ত ষোল সতেরো। এতই ডেভেলপ্‌ড্‌ বডি ছিল।

—সে তো আমি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

—নটি, যা বলছি শোন, রাখঢাক কথাবার্তা আমার পছন্দ হয় না। আমার দেহটার ওপর অনেকেরই লোভ ছিল। পাতানো কাকা থেকে আরম্ভ করে খুড়তুতো দাদা কী বাবার ছোট শালা, কারোরই লোভের নজর থেকে এড়িয়ে যেতে পারিনি।

—কতটা এগুনো হয়েছিল ?

—জেলাসি ?

—প্রেমে জেলাসি থাকেই।

—ওয়েল। বাট ডোণ্ট বী কনজারভেটিভ। নারী পুরুষের সম্পর্ক আমি মনে করি অবাধ হওয়ার প্রয়োজন। অবশ্য কার সঙ্গে মিশব কার সঙ্গে মিশব না দ্যাট ডিপেন্ডস্‌ অন ওয়ানস্‌ পার্সোন্যাল টেস্ট্‌। তার মানে এই নয় ডিবচারি।

—স্যরি কস্তুরী, আমি তোমার মত অত উদার হতে পারছি না। যখন তখন যার সঙ্গে ইচ্ছে হবে—,

—নো, নট অ্যাট অল। আই ডোণ্ট মীন সো। রাদার আই হেট নিম্‌ফোম্যানিয়াকিজ্‌ম। আমার মতে ভালোবাসার প্রথম অনুভূতি আসে মনে, মন থেকে শরীরে।

—তা মন যদি যখন তখন যেখানে খুসী ঝাঁপ দিতে চায় ?

—কেন দেবে ? তার পেছনে কারণটাকে খুঁজে পেতে হবে। আমার কিশোর বেলার এপিসোডগুলো কোন প্রেম নয়। একটা খেলা। তারাও মজা পেতো। আমিও। তারপর জীবনে আরো দু একজন পুরুষ এসেছিল। তবে তাদের না ছিল ব্যক্তিত্ব না

ছিল আকর্ষণ করার ক্ষমতা। তারা এসেছিল আমার আগুনে রূপে ঝাঁপ দিতে।

—কিন্তু মিঃ সান্যালকে বিয়ে করাটা। আমি জানি, তোমাকে দিয়ে তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোন কাজ করানো যায় না।

—ঈশ্বর বলে কেউ থাকলে, অথবা ভাগ্য, তাহলে বলতে হবে, সেটা তাদেরই মারপ্যাঁচে ঘটেছিল। বিরাট ব্যবসায়ী বাপের একমাত্র মেয়ে হয়েও, ধনী বাবা শেষ পর্যন্ত দেউলে হয়ে গিয়েছিলেন শয়তানের চক্করে পড়ে। বসত বাড়িটাড়ি সব বিক্রি করে দিতে হত। বাঁচিয়েছিলেন সান্যাল কাকু। এবং সেই বাঁচানোর ফীজ হিসেবে দাবী করেছিলেন একমাত্র মেয়ে কস্তুরীকে। উপায় ছিল না সুমন, বাবার সম্মান না আমার স্বামী সুখ? শেষ পর্যন্ত কাকুটি হলেন স্বামী। টিল টু-ডে আই হেট হিম বাট এনজয় হিজ মানি, নো প্রিক্ অব কনসায়েন্স। আগুনে হাত দিলে হাত তো পুড়বেই। মিঃ সান্যালের সেটা তখন জানা না থাকলেও এখন জেনে গেছেন।

—উনি আপত্তি করেন না?

—বউয়ের মন পাবার জন্যে, নাকি ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেবার জন্যে, সব সম্পত্তি আমার নামেই করা আছে।

—রিয়েলি, ইউ আর লাকি। কিন্তু আমাকে তো এখন ফিরতে হবে।

—তা তো যেতেই হবে, দেখি বাগডোগরার অ্যাকোমোডেশান পাওয়া যায় কিনা?

এগারো

শেষ পর্যন্ত শম্ভু দালালকে খুঁজে পাওয়া গেল। না কোন অলৌকিক উপায়ে নয়। নিতান্তই চেষ্টা আর যোগাযোগ। অবনীমোহনকে সঙ্গে নিয়ে শিউলি গিয়েছিল পুরনো পাড়ায়। শিউলি অবশ্য পাড়ার মধ্যে ঢোকেনি। অবনীমোহনকে একাই যেতে হয়েছিল। প্রায় সন্ধ্যের মুখে। খুবই অস্বস্তি হচ্ছিল। সেই অবিশ্বাস্য পলায়নের দিনে অবনীমোহনকে কতবার পুলিশের

হাত থেকে বাঁচার জন্যে নিষিদ্ধ পল্লীতে আশ্রয় নিতে হতো। আর এমনি করেই একদিন পরিচয় হয় শিউলির সঙ্গে। কিন্তু সেদিনের সঙ্গে এদিনের অনেক তফাৎ। আজ আর কারো ভয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয় না। কিন্তু এরই মধ্যে তার বয়েস বেড়ে গেছে। পাতি মধ্যবিত্ত নীতিবোধের বেশ কিছুটা গ্রাস করে নিয়েছে। এখন লোকচক্ষুর বেড়াজাল, কেউ এমন সময় এই নিষিদ্ধ পল্লিতে দেখে ফেললে কি ভাববে এমন সব দ্বন্দ্ব তাঁকে ঘিরে ফেলেছে।

সামান্য দ্বিধাগ্রস্ত মনে, সংকোচ কাটিয়ে সবে জমে ওঠা সোনাগাছির গলিতে ঢুকে কিছুক্ষণ একপাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। কে শম্ভু দালাল তা তাঁর জানা নেই। জীবনে কোনদিনও তাকে দেখেননি। কেবল শিউলির মুখে শুনেছেন, কোঁকড়া চুল, গোঁফ আছে আর পাট্টাই বেঁটে খাটো কালোকুলো একজন টাউট। যার কাজ খদ্দের ধরে মেয়েদের ঘরে পেঁছে দেওয়া। কিন্তু বর্ণনা মতো তেমন কাউকেই দেখতে পাচ্ছিলেন না। একবার মনে মনে ভাবলেন এ'তো খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজার অবস্থা। অথবা বুনো হাঁসের পালক খুঁজে বার করা। মিনিট পনেরো দাঁড়াবার পর লক্ষ্য করলেন প্রায় কাছাকাছি চেহারার একটি ছেলে দুটি কলেজে পড়া ছাত্রের সঙ্গে দর কষাকষিতে ব্যস্ত। শেষ পর্যন্ত ছেলে দুটি মাথা নাড়তে নাড়তে অন্য দিকে চলে গেল। কী মনে হতে সাহস করে এগিয়ে গিয়ে অবনী সেই ছোকরাটিকে পাকড়াও করে বসলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ ভাই, শম্ভু বসে কাউকে তুমি চেনো?

জ্বলন্ত বিড়ি মুখে ছোকরাটি অবনীর দিকে তেরচা চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, পারবেন দাদু?

হকচকিয়ে গিয়ে অবনী জিজ্ঞাসা করেন, পারবেন মানে?

—এই বয়েসে এই রকম পিংলি চেহারায়, মরুক গিয়ে আপনি শখ করবেন আমার কী। তা শম্ভুর দরকার কী, আমি তো আছি। রোগা না একটু মোটা, কালো না ফরসা? আজকাল আবার বাবুদের একটু কালী কালী জেনানাদের পছন্দ। শালা, টেস্ট সব বিগড়ে যাচ্ছে মাইরি। বয়েস কী রকম হলে চলবে? আঠারো না পঁচিশ! ভালো জায়গায় নিয়ে যাব। প্রতি মাসে ডাক্তার দিয়ে চেক করিয়ে নেয়। পরে বলতে পারবেন না এখানে এসে রোগ বাধিয়ে বসেছেন। তবে দাদু, একটা কথা বলতে পারি, একটু

বেশী পয়সা খরচ করুন, এমন জিনিসের কাছে নিয়ে যাব···দেখলে হাঁ হয়ে যাবেন।

অবনী বুঝতে পারেন, এ ছোকরা বড্ড বেশী বকে। কোনরকমে ওকে থামিয়ে বলেন, কিন্তু ভাই, আমি ওদের কারো কাছেই যেতে চাই না। শম্ভুর সঙ্গে আমার একটু ব্যক্তিগত দরকার।

—কেন বলুন তো? হঠাৎ এদ্দিন পর শম্ভুকে কী দরকার?

—দরকারটা আমি তাকেই বলব। বল কোথায় গেলে তাকে পাওয়া যাবে?

—তাকে পাবেন না।

—সেকী? কেন?

—আপনি কী খদ্দের না খোঁচর?

—খোঁচর মানে?

—আই বি, পুলিশের পোষা কুত্তা।

—না। আমি একজন সাধারণ মানুষ।

অ। তা শম্ভু তো লাইন ছেড়ে দিয়েছে। এখন ঘর থেকে বেরোয় না। আর শালা হ'ল কী জানেন, সুড্ডা আমায় একদিন লেড়কা বলে ডেকে ফেলল। বলল আমারও কেউ নেই তোরও কেউ নেই। চলনা দুজনে বাপ বেটা হয়ে থাকি। মাইরি বলছি দাদু, বিশ্বাস করুন, শম্ভুর কথা শুনে সেদিন আমার মনটা কেমন যেন আনচান করে উঠেছে। আমার তো শালা বাপ মা কেউ নেই। শুনেছিলুম যমুনা বলে একটা এখানকার মেয়ে নাকি আমায় জম্মো দিয়েই ভবের খেলা শেষ করে হাওয়া। এখানে আমাদের লাইনে আর সব যারা আছে তাদের কারোরই কোন বাপ নেই। তা ফোকটে একটা বাপ পেয়ে গেলে ক্ষতি কি? আপনিই বলুন।

—ও, তাই বল। তুমি শম্ভুর ছেলে?

—পাতানো ছেলে। আসল ছেলে হলে কী আর এ পাড়ায় থাকতুম?

—আমাকে একটু শম্ভু কাছে নিয়ে যাবে?

—কী হবে শম্ভুর কাছে গিয়ে? বয়েস হয়েছে। তার ওপর শালা রোগের ডিপো। নেহাৎ বাপ বলে স্বীকার করেছিলুম নইলে কবেই ফুটিয়ে দিতুম।

—তোমার নামটা কী ভাই ?

—বাঁকা। ভালো নাম বঙ্কিম। শম্ভু বাবারই দেওয়া নাম।

—তা বাঁকা ভাই, আমায় একবার তার কাছে নিয়ে যাবে ?

—কিন্তু আমার তো লহর করার টাইম নেই। আপনি মাইরি এখন ফুটুন। সন্ধ্যেটা বরবাদ হয়ে গেলে সারা রাতটাই মাটি।

—না না, আমি তোমার প্রফেশান হ্যাম্পার করতে চাই না। বেশ তুমি তার ঠিকানাটা আমায় দাও। আমি ঠিক খুঁজে নোব।

—আচ্ছা মাইরি, আপনি কি টাকাকড়ি পান, শম্ভুদার কাছ থেকে ?

—আরে না না সেসব কিছুই নয়।

বাঁকা মনে মনে বিড় বিড় করে, খুব ত্যাবরা কেস মনে হচ্ছে। দূর শালা, আমার কী, নিন, লিখে নিন, সঙ্গে কাগজ পেনসিল আছে তো।

একটা ছোট্ট ডায়েরী অবনীমোহনের কাছে সর্বদাই থাকে। তিনি ওটার পাতায় লিখে নিলেন বাঁকা প্রদত্ত ঠিকানাটা। শোভা-বাজারের কাছে একটা ঠিকানা।

অবনী ঠিকানা নিয়ে চলে আসছিলেন। বাঁকাও চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ কী খেয়াল হতে অবনীর সামনে এসে বলে, কিছু মাল হড়কান। সন্ধ্যে থেকে মাইরি এখনও কিছু বউনি হয়নি। সব শালা ফেরেব্বাজ হয়ে গেছে।

কী আর করা। অবনী পকেট হাতড়ে পান পাঁচ টাকার ছেঁড়া ফাটা নোট। সেটাই তুলে দেন বাঁকার হাতে। বাঁকা একবার নোট হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে, ভাবা যায় দাদু, একটা সভ্য সমাজ চলছে এইসব নোটের ওপর দাঁড়িয়ে। শালা ফরেনারবাবুরা এসে আমাদের কী ভাবে কে জানে। আচ্ছা দাদু, গুড নাইট, বলে বাঁকা অন্যদিকে পা বাড়ায়। অবনীও দ্রুত গলি পেরিয়ে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউতে ফিরে আসে। শিউলি তখন ফুচকা খেতে ব্যস্ত। অবনী আসতেই জিজ্ঞাসা করলেন, খাবে নাকি, বড়িয়া ফুচকা। আগে রোজ খেতাম, এখন আর শখটা নেই।

—না, আমি ওসব খাই না। তুমি তাড়াতাড়ি শেষ করে নাও।

আর একটা জলভরা ফুচকা মুখে নিতে নিতে শিউলি জিজ্ঞাসা

করে, কিছু কাজ হল ? শম্ভুকে পাওয়া গেল ?

—না। তবে শম্ভুর ঠিকানা পাওয়া গেছে। ওর অ্যাডাপটেড সনটির সঙ্গে দেখা। সেই দিল। বেশীদূর যেতে হবে না। কাছেই। শোভাবাজারে। চল ঘুরে আসি।

বাড়িটা খুঁজে পেতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। বস্তি অঞ্চলের একফালি একটা ঘর। ডাকটা দিলেন অবনী নিজেই, শম্ভুবাবু বাড়ি আছ ? শম্ভুবাবু।

মিনিটখানেক পর ঘরের পাল্লা খুলে এক বৃদ্ধের মুখ ভেসে উঠল, কিস্‌কো মাংতা ?

এবার শিউলিই এগিয়ে গিয়ে বলে, আমায় চিনতে পারছ শম্ভু ?

বাইরের আলো তখন রাত ঘোষণা করছে। তার ওপর কর্পোরেশনের আলোগুলোও টিমটিম করছে। ঘর থেকে একটা হ্যারিকেন এনে শিউলির মুখের কাছে তুলে ধরে অনেকক্ষণ ওকে নিরিক্ষণ করতে করতে বলে, শিউলিদি ?

—যাক তাহলে চিনতে পেরেছ ?

—বহুত পালটে গেছেন দিদি।

—তুমিও অনেক বদলে গেছ শম্ভু। বুড়ো হয়ে গেছ।

—হ্যাঁ দিদি, তার ওপর বহুত বিমার বাসা বেঁধেছে। লেকিন আমার ঘরটা বহুত ছোট। তকলিফ না হয় তো আসেন। ভেতরে আসেন।

ঘরটা সত্যিই খুব ছোট। দুদিকে দুটো খাটিয়া মতো পাতা। রঙ চটা ছেঁড়া ছেঁড়া চাদর ঢাকা। বাকী আসবাব বলতে একটা টিনের সুটকেশ। রান্নাবান্নার ব্যাপারটাও ঐ ঘরের মধ্যেই। দেয়ালের পেরেকে টাঙানো আছে একটা আধময়লা শার্ট আধময়লা প্যাণ্ট।

—বসেন দিদি, কষ্ট করে ঐ খাটিয়াতেই বসেন। আপনিও বসেন বাবুজি।

দুজনেই গিয়ে খাটিয়ার ওপর বসে পড়েন। শম্ভু মাটিতেই বসতে বসতে বলে, লেকিন আচানক আমার ঘরে কেন দিদি ?

—আমার একটা উপকার করতে হবে শম্ভু।

—উপকার! এখোন তো আমার সে দিন নেই দিদি। কোই

রোজগারও নেই, ধান্দাভি খতম। থাকি বাঁকার দয়ায়।

এবারে অবনী উত্তর দেন, না শম্ভুবাবু, যে উপকারটা আপনাকে করতে হবে তার সঙ্গে অর্থের কোন সম্পর্ক নেই। শুধু একটু মনে করার ব্যাপার।

—আপনার এ কোথার মানে বুঝলুম না বাবুজি।

—শিউলি, তুমিই বল, কারণ ঘটনাটা তো তোমাদের দুজনের মধ্যেই ঘটেছিল।

—হ্যাঁ, বলছি, বলে সামান্য একটু সময় নিয়ে শিউলি জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা শম্ভূ একটু মনে কবে বল তো, আজ থেকে প্রায় তেইশ বছর আগে ডাস্টবিনের ধার থেকে একটি বাচ্চাকে কুড়িয়ে পেয়েছিল, মনে আছে সে কথা?

—তেইশ বরষ কিনা সেটা এখোন মালুম নেই, লেকিন,

—থামলে কেন বল।

—আপনার কাছে একটা বাত ছুপিয়ে রেখেছিলাম। সাচ্ বলছি, বাচ্চাকে আমি কোথাও কুড়িয়ে পাইনি দিদি। এক বাবু আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল, ইটাকে বাঁচিয়ে রাখ শম্ভু। রেণ্ডি করতে হবে। পরে কাজে লাগবে। লেকিন উস্‌দিন আমার বহুত কস্ট্ হয়েছিল। মনে হয়েছিল ই কাম করলে হামার পাপ লাগবে। জিন্দেগীমে বহুত বুড়া কাম করেছি। বহুত লেড়কাকে জাহান্নমের রাস্তায় পাঠিয়ে দিয়েছি। লেকিন এত্‌না ছোটি বাচ্চা, দুনিয়ার আচ্ছা বুড়া কিছু জানে না। তাকে জাহান্নমে পাঠাতে মন চাইলো না। লেকিন, হাম তো সাদিউদি কুছ নেহি কিয়া। না কোই ঘরবালি, না কোই জানপয়ছানবালা। আপনাকে দিদি আমার বহুত ভালো লাগতো। তো,

এবার শিউলি আর অবনী দুজনেরই বিস্ময়ের পালা। শম্ভুর কথার অর্থ কোন এক বাবু অহনার জন্মসূত্র জানে। অর্থাৎ সেই লোকটিকে খুঁজে বার করতে পারলেই। শিউলি বেশ উদ্‌গ্রীব হয়েই জিজ্ঞাসা করে, বাচ্চাটাকে কে তোমার হাতে তুলে দিয়েছিল শম্ভু? নিশ্চই সে তোমার জানাশোনা। নইলে,

ওকে বাধা দিয়ে শম্ভুই বলে, আপনি তাকে চিনেন দিদিজি। আপনার কাছে এখোন বলতে হামার কোই বাধা নেই। ঐ বাবু সেদিন হামাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিল। লেকিন দিদি আমি

বেইমানী করেছি। মেয়েটাকে রেণ্ডি বানাইনি। আজ যদি সেই বাবু হামাকে পাকড়াও করে,

—সেই লোকটাকে আমাদের পাকড়াও করতে হবে শম্ভু। বল লোকটা কে ?

—গুস্সা করবেন না দিদিজি, ঐ বাবুতো আপনার ঘরেই হরবখত্ আসতো।

—আমার ঘরে ? কি নাম ?

—নাম তো বলতে পারব না। আমরা যারা রেণ্ডির দালালি করে পেট চালাই, তারা বাবুদের চেনে, লেকিন তাদের নাম পাত্তা জানে না। ই সব তো হামাদের কাম নয়।

— কেমন দেখতে ছিল, মনে আছে ?

—হামার সঙ্গে বহুত দিন দেখা হয়নি। লেকিন হুলিয়াটা কুছ কুছ ইয়াদ আছে। একটু নাটা, গায়ের রঙ ছিল বহুত কালা। পান ভি খেতে যাদা। আউর,

—আর কী ?

— উনকা ডাহিনা পায়া থোরা শর্ট যা। উসি লিয়ে হাঁটবার সময়ে একটু পায়া টেনে টেনে হাঁটতো।

—বনবিহারী ?

—বলতে পারব না দিদিজি।

স্মৃতির কবর খুঁড়তে খুঁড়তে শিউলি প্রায় বিড়বিড় করে, বেঁটে কালো এমন অনেক লোক আমার কাছে আসতো, কিন্তু সপ্তাহে তিনদিন আমার কাছে ডান পা টেনে টেনে আসতো একমাত্র বনবিহারী দত্ত। একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বলেছিল জন্ম থেকেই ওর ডান পা-টা ছোট।

— বনবিহারী থাকে কোথায় শিউলি, উদ্গ্রীব প্রশ্ন অবনীমোহনের।

এরা কেউ নিজেদের সঠিক ঠিকানা জানায় না। তবে ও বলেছিল ব্যবসা করে। প্রচুর কাঁচা টাকার রোজগার ছিল। এর বেশী তো আমাদের জানার প্রয়োজন হ'ত না।

আক্ষেপে মাথা দোলান অবনী। নিজের মনেই বলেন, অ্যাবসার্ড। মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়া মুক্তোর খোঁজ কেউ কখনও পায় না। কলকাতা শহরে লক্ষ লক্ষ ব্যবসায়ী আছে। তাদের

একজনের নাম বনবিহারী। আজ থেকে তেইশ বছর আগে কোন এক বনবিহারীকে খুঁজে পাওয়া······ তার ওপর সে বেঁচে আছে কিনা কে জানে······না ঃ শিউলি। এ হবার নয়। আমরা যাই শম্ভুবাবু, আপনাকে একটু কষ্ট দিলাম।

অবনী উঠে পড়লেন। শিউলি কিন্তু তখনও সেই ভাবেই বসে ছিল। তাকে সামান্য হতাশ লাগছিল। অবনী আবার তাগাদা দেন, ওঠো শিউলি। অযথা সময় নষ্ট করে কোন লাভ নেই। আমি বলি কি মরীচিকার পেছন না ছুটে যা সত্যি তাকেই স্বীকার করে নিতে হবে। অহনার অলীক চাওয়া থেকে ওকে আমাদের ফিরিয়ে আনতেই হবে।

—অহনা কৌন বাবুজি? শম্ভু জিজ্ঞাসা করে।

—সেদিন যে মেয়েটাকে তুমি তোমার এই দিদির হাতে তুলে দিয়েছিলে, সেই অহনা।

—বলেন কি দিদি, সেই লেড়কি এখনও জিন্দা আছে?

—শুধু আছে না শম্ভু, সে এখন এই বাবুর মেয়ে। লেখাপড়া শিখে দস্তুর মতো লেডি।

—তাহলে আর কেন পাঁক ঘাটতে চাইছেন? তাতে সব কুছ নোংরা হোবে, গন্ধা ছাড়বে।

—হ্যাঁ শম্ভু, তোমার কথাই ঠিক। আমরা কেউ তা চাইনি। কিন্তু—,

- লেকিন?

—ওর বাবা চান না সত্যিটাকে গোপন করে মেয়ের বিয়ে দেওয়া হোক।

—লেকিন বাবুজি, আমি আনপড় আদমি আছে। হামার গোস্তাফি মাপ করবেন, লেকিন কিছু সতাকে ছুপিয়ে রাখতেই হয়। নইলে সংসারে সুখ থাকে না, শান্তি থাকে না। সব বরবাদ হয়ে যায়। আপনি কি লেড়কিকে সব কিছু বাতিয়ে দিয়েছেন বাবুজি?

—হ্যাঁ শম্ভু, আমি চাইনি সব কিছু গোপন করে অহনার বিয়ে দিই। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, যে সত্য কোনদিনও প্রকাশ পাবে না, যে সত্য বড়ো অপ্রিয়, বোধ হয় সেই অপ্রিয় সত্যের খোঁজ না করতে চাওয়াই ভালো ছিল। কি জানি, এও আবার আর এক ভুল কিনা?

অবনী বেরিয়ে আসছিলেন। শিউলিও চলে আসছিল। হঠাৎ কী মনে হতে শিউলি দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর শম্ভুর কাছে গিয়ে বলে, তোমার তো এখন কোন কাজ টাজ নেই, তাই না?

—হাঁ দিদিজি, বিলকুল বেকার হুঁ।

—পারবে সেই বনবিহারীর পাত্তা লাগাতে? আমি তোমায় টাকা দোব শম্ভু। আমার সামর্থ্য অনুযায়ী। জান তো যে বেশ্যা তার পসার ছেড়ে দেয় তার ভাঁড়ারও বেশী দিন ভর্তি থাকে না। তবু, দু একটা গয়না এখনও আছে।

—এ আপনি কী বলছেন দিদিজী। এই কামের জন্যে হামি আপনার কাছে পয়সা লিব। এ লেড়কি তো হামারও লেড়কি আছে। আপ ফিকর মাত কিজিয়ে। এখোন হামান শরীর দুবর্ল হয়ে গেছে। বিমার ভি লেগেই আছে। লেকিন, ঠিক হ্যায় দিদি, আপ যাইয়ে, হাম তালাশ মে রহেগা। লেকিন আগর ও বনবিহারী জিন্দা রহে তো…

অবনী আর শিউলিকে ফিরতে হয় একটি অকৃতকার্য সন্ধ্যা কাটিয়ে।

বারো

ফ্ল্যাটের সামনে পঁচিশ ফুট চওড়া রাস্তায় তখনও ছোটখাটো ভিড়। আশপাশের ফ্ল্যাট থেকে ছেলে বুড়ো সবাই জড়ো হয়েছে। শেষরাতেই সুমনের দাদার দমের ঘাটতি সুরু হয়। গোঙানীর আওয়াজ শুনেই সুনন্দা উঠে পড়ে। দেখে সুজন মানে সুমনের দাদার তখন চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। খুব জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টা করছে। সেই মুহূর্তে সুনন্দা কী করবে ভেবেই পায়না। ঘরে আরো একজন প্রাণী থাকলেও তিনি না থাকারই সমান। তবু উঠে একটা সরবিটেড খাওয়ানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তার আগেই সুজন নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। না, সুনন্দার চোখে কোন জল আসেনি। আকাশে মেঘ জমলেই বৃষ্টি হবে। এই সহজ সত্যটা ওর জানা হয়ে গিয়েছিল। ও কেবল ভাবছিল এরপর ও কি করবে? এভাবে প্রত্যক্ষ মৃত্যু অভিজ্ঞতা ওর ছিল না। সুমন নেই। কবে আসবে তারও ঠিক নেই। মনে পড়ল ওর বাবার কথা। বাইরে বেরিয়ে

এসে পাশের ফ্ল্যাটের দরজায় নক করল। অত ভোরে দরজায় কেউ কড়া নাড়লে বেজার হতেই হয়। বেজার মুখে দত্তগিন্নি বেরিয়ে এসে দাঁড়াতেই, আশ্চর্য নির্লিপ্তস্বরে সুজনের মৃত্যু সংবাদ জানিয়েছিল। তারপর যা হয়েছিল সবই পাড়াপড়শীদের তৎপরতায়। সুমনকে খবর দেওয়াটাও ওদেরই চেষ্টায় হয়েছিল।

সুমন যখন এসে পেঁছিল তখন প্রায় শেষ বিকেল। কস্তুরীই ওকে নামিয়ে দিয়ে গেছে। আবাসনের ছেলেরাই সব কিছু রেডি করে সুমনের জন্যে অপেক্ষা করছিল। চারদিক তাকিয়েও কোথাও সুনন্দাকে দেখতে পেলো না। তবে অনেক অনেকদিন পর অহনাকে দেখল। ভিড়ের মধ্যেই ও একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সুমনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ও নিজে থেকে এগিয়ে এল। তারপর কাছে এসে বলল, তোমার জন্যেই ওরা বেরুতে পাচ্ছে না।

অবাক চোখে একবার অহনার দিকে তাকিয়ে সুমন বলল, হুঁ। বৌদি? মা'

—ঘরেই আছে।

আর কিছু না বলে সুমন ওপরে চলে আসে। শূন্য বিছানায় খাটের ছত্রিতে হেলান দিয়ে সুনন্দা নিথর প্রতিমার মতো একা বসে আছে। দৃষ্টি উদাস। চকিতে খাটের নীচে চোখ চলে যায়। মা, ঘুমুচ্ছেন। নিশ্চিন্তে। সুমন ধীরে ধীরে সুনন্দার কাছে এসে দাঁড়ায়। খুব নরম গলায় বলে, দাদাকে নিয়ে যাচ্ছি।

মাত্র একবারের জন্যে সুনন্দা ঘাড় নেড়ে পূর্ববৎ হয়ে যায়। আর তখন দাঁড়াবার সময় ছিলনা। সেই একই পোষাকে সুমন নীচে নেমে আসে। ডেডবডির কাছে তখনও অহনা দাঁড়িয়ে। ওর কাছে গিয়ে বলে, মা আর বৌদি একা রইল। বৌদি খুব আপসেট। পারতো খেয়াল রেখো।

সুজনকে নিয়ে ওরা চলে যাবার পর আবাসনের বাসিন্দারাও ধীরে ধীরে নানারকম হাহুতাশে পরিবেশ থমথমে করতে করতে যে যার নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে গেল। অহনা ভাবছিল তার এখন কী করা উচিত। মৃত্যু যেমন ব্যবধান তৈরী করে আবার কখনও বা সংকোচ ঘুচিয়ে কাছে টেনে আনে। ব্যক্তিগত পরিতাপ ফ্রাস্টেশানে ভুগতে ভুগাত একদিন সুমনকে ও তাড়িয়ে দিয়েছিল অপমান

করে। কিন্তু সুজনের মৃত্যুতে ওর মনে হল সুমনদের বড়ো ক্ষতি হয়ে গেল। এখনও অহনা জানেনা সুমন অ্যাড-ফিল্মে কাজ করে বেশ কিছু রোজগার করছে। অহনা কেবল ভাবছিল সুজনের রোজগারেই ওদের পরিবার চলে। যদিও তার নিজের কোন আর্থিক সঙ্গতি নেই। কিন্তু সময়ে অর্থের থেকেও সহানুভূতি আর বিপদে পাশে এসে দাঁড়ানোটাই অনেক পিছু। তাছাড়া সে তার ব্যাক্তিগত কারণে সুমনকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। সুমন তো তার প্রতি কোন অন্যায় বা অবিচার করেনি। নিজের অপমানিত জন্মের কথা ভুলে গিয়ে ও ছুটে এসেছে সুমনের কাছে। ওদের পরিবারের পাশে।

অবনীমোহন সব কিছুই লক্ষ্য করছিলেন। একা অহনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে উনি পাশে এসে কাঁধে হাত রাখতে রাখতে বলেন, ছিঃ মা, এখনও কী পুরনো কথা ভাবার সময় আছে। যা, ওর বৌদি, মা, এখন খুবই অসহায়। ওদের কাছে গিয়ে একটু বোস। সব সময় কী নিজের কথা ভাবলে চলে? তুই যা।

মনে মনে অহনাও তাই চাইছিল। ও আর কিছু না বলে দোতলায় চলে গেল। সুনন্দা খাটের ওপর একই ভাবে বসে আছে। নীচে সুমনের মা অঘোরে ঘুমচ্ছেন। অহনার মনে হল হল জগতে পাগলরাই বোধহয় সব থেকে সুখী। দুঃখ কষ্ট শোক এর কোনটাই বোধহয় ওদের টাচ্ করে না।

খানিকক্ষণ খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে থাকার পর অহনা বলে, বৌদি, সারাদিন তো পেটে কিছুই পড়েনি। মমে হয় এখন কিছু খাবেও না। একটু চা করি।

উত্তরের অপেক্ষা না করে ও বান্নাঘর কাম সুমনের বেডরুমে চলে যায়। উঃ কতদ্দিন পর এ ঘরে আসা। সব আগের মতই আছে। গ্যাস, ওভেন, মীটসেফ, রান্নার সরঞ্জাম আর একদিকে সুমনের নেয়ারের খাটিয়া। কিছু বই ছড়ানো। বোধহয় নতুন কিছু লিখছে। পেপার ক্লীপে আঁটা দিস্তেখানেক কাগজ।

এক শোক সাময়িক হলেও অন্য দুঃখকে ভুলিয়ে দেয়। নিজের মানসিক দ্বন্দ কাটিয়ে ও চা তৈরী করতে গিয়ে দেখে চা আছে, চিনি আছে কিন্তু দুধ নেই। র'চা তৈরী করে বৌদির কাছে নিয়ে আসে।

—নাও, এটুকু খেয়ে নাও। দুধ পেলাম না। কালো চা-ই খাও।

কী জানি কেন সুনন্দার দিক থেকে কোন আপত্তি এলো না। চায়ের কাপটা নিয়ে একচুমুক একচুমুক করে খেতে শুরু করল।

—বৌদি কিছু খাবে? তোমার খুব খিদে পেয়েছে মনে হচ্ছে। এখন আর অত কেউ মানে না কিন্তু।

নীরবে ঘাড় নেড়ে সুনন্দা জানায় তার এখন কিছু খেতে ভালো লাগছে না।

- মাসীমা জানেন?

অনেকক্ষণ পর সুনন্দা কথা বলে, কী জানি?

—মাসীমাকে চা দোব?

—থাক।

এই বিপদ মুহূর্তে আর কী বলা যায় সেটা অহনা ভেবে পেলো না। ও চুপ করে সুনন্দার পাশে বসে রইল কিছুক্ষণ। অহনার খুব ঘুম পাচ্ছিল। ভোরে উঠে খবরটা শোনার পর ও সটান এখানেই চলে এসেছে। দুপুরে একবার বাড়ি গিয়ে ভেবেছিল রান্না চাপিয়ে দেবে। সেটাও আর ইচ্ছে করেনি। অবনীমোহন কিছু রুটি আর কলা কিনে এনেছিলেন। সেই দিয়েই দুপুরের খাওয়া হয়েছিল। তারপর থেকে কেবলি সুমনের ফিরে আসার জন্যে অপেক্ষা। সুমন ফিরে আসতে ও নিজে গিয়েই ওর সঙ্গে কথা বলেছে। আসলে তার রাগটা ছিল নিজের উপর। নিজের জন্মরহস্যের ওপর। কিন্তু সুমনকে তো সে সত্যিই ভালবাসে। সেদিনের সেই ঘটনার পর একা একাই কেঁদেছে সুমনের জন্যে। ও খুব ভালোকরেই জানে সুমন ছাড়া বাঁচতে পারবে না। সুমনকে ছাড়া যেমন ও বাঁচবে না ঠিক তেমনি সুমনের করুণা আর দয়াটাও ওর কাছে বিষবৎ পরিত্যাজ্য।

হঠাৎই ওর মনে হল সুমনকে সব কথা খুলে বলার দরকার। অন্য কিছু না, সুমনের সাহায্যটাও ওর প্রয়োজন। যেমন করেই হোক নিজের জন্মরহস্য তাকে খুঁজে পেতে হবে। বাবির বয়েস হয়েছে। শিউলি মাসীরও বয়েস হয়েছে। তাদের পক্ষে সেই শম্ভুদালালকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তাই একজন শক্ত সমর্থ

যুবক, যাকে সে ভালবাসে তার সাহায্য পেলে হয়তো সঠিক একটা জায়গায় পেঁছানো যেতো।

এই সব নানান কথা ভাবতে ভাবতে কখন যেন ও বৌদির বিছানাতেই শুয়ে পড়েছিল। ঘুমটা ভাঙল 'বলহরি' শব্দে। ঝটিতি উঠে বসে। একটা বালিশে হেলান দিয়ে সুনন্দাও আধ-শোওয়া আর আধাঘুমের মধ্যে ছিল। 'বলহরি' আওয়াজে দুজনেই উঠে বসে। সবে ভোর হচ্ছে। অহনা তাড়াতাড়ি নীচে নামতে যাচ্ছিল। সুনন্দা বাধা দেয়, দাঁড়াও অহনা। আমি সব গুছিয়ে রেখেছি। ঐ যে লোহা, বাতাসা, জল আর নিমপাতা। ওগুলো নিয়ে নীচে যাও। হিন্দুদের নিয়ম কানুন। সেতো মানতেই হবে।

—কিন্তু মাসীমাকেও তো একবার ডাকা দরকার।

—কী দরকার? মা জেগেও যা ঘুমিয়েও তাই। বুঝতেই পারবেন না তার ছেলে চলে গেছে। তুমি যাও ভাই। আর দেরী কোর না। সুমন খুব ক্লান্ত। এসে এক মিনিটও বসার সময় পায়নি।

অহনা নীচে চলে গেল। শ্মশান বন্ধুরাও খুব একটা কেউ ওপরে এলো না। দু একজন এসে সামান্য গতানুগতিক কিছু কথা বলে চলে গেল। সব শেষে এল সুমন। তার পেছনে অহনা।

হিন্দু নিয়মে ছোটভাই মুখাগ্নি করলে ধরাচুড়া পড়তে হয়। সুমন ওসব কিছুই করেনি। অহনা অনুযোগ করলেও সুনন্দা কিন্তু কিছুই বলল না। ও তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিয়ে চা বসালো।

—কাল সারারাত এখানেই ছিলে অহনা?

—হ্যাঁ। একজনের তো থাকা দরকার।

-ভালোই করেছ। এবার তুমি বাড়ি যাও। তোমাকে খুব ক্লান্ত লাগছে। রাতে বোধহয় ভালো করে ঘুম হয়নি।

সত্যিই অহনা খুব টায়ার্ড হয়ে পড়েছিল। আর কিছু না বলে সে বাড়ি চলে গেল। চা খেতে খেতে সুমন একবার সুনন্দার দিকে তাকিয়ে বলে, কাজ টাজ মিটে গেলে তোমার কথা ভাবতে হবে।

—আমায় কি তাড়িয়ে দেবে ?

—কেন ?

—তাহলে আর নতুন করে কী ভাববে ?

—সে তখনি ভাবব। তবে বিধবাদের মতো থানটান পড়ে বোসো না যেন। ওটা আমি একেবারেই সহ্য করতে পারি না। মাকে ডেকে দাও। হয়তো কিছুই বুঝবে না। না বোঝাই ভালো। আমি একটু শোব। প্রায় দু রাত্রি আমার ঘুম হয়নি। দু রাতের একটা রাতে কেন যে ভালো ঘুম হয়নি সেটা সুনন্দাকে বলা যায় না। কস্তুরী প্রসঙ্গ বোধহয় কাউকেই বলা যাবে না।

ও চলে যাচ্ছিল। সুমনের না বলা কথাটারই জের টানল সুনন্দা, কেন, রাতে তোমার ঘুম না হবার তো কোন কারণ নেই। রাতের বেলাতেও তোমার শুটিং হয় নাকি ?

—হয় সুনন্দা, অনেক সময়েই হয়।

সুমন চলে যায়। নাকি পালিয়ে সুনন্দাতে এড়াতে চায় ! কে জানে। তবে ঘুমটা এখন খুবই দরকার। দুদিন পরই বড় ছবির ব্যাপারে মিস্টার কাপাডিয়ার সঙ্গে দেখা করতে হবে। কস্তুরীই সব ব্যবস্থা করেছে।

তেরো

কথায় আছে মেয়েদের চরিত্রের জটিলতা দেবতারাও জানতে পারেন না। প্রবাদ হলেও মাঝে মাঝে সে রকম কিছু ঘটে যায়। নইলে যে অহনা নিজের জন্মের কলঙ্কে নিজের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছিল, একসময়ে নিজেকেই নিজের কাছে ঘৃণিত প্রানী বলে মনে করতো, এমন কি যে সুমনকে ছাড়া অন্য কোন ছেলেকে বিয়ে করার কথা ভাবতে পারতো না, তাকেই একদিন প্রচণ্ড অপমানে ফিরিয়ে দিয়েছিল, সেই অহনাই আবার নতুন করে জীবনে ফিরে আসতে চাইল। হঠাৎ ওর মনে হল অবনীমোহনের কথা। সে কেবল নিজের কথা ভেবেছে। কিন্তু অবনীর কথা ভাবেনি। ভাবেনি ওই মানুষটা সারাজীবন একটা স্বপ্নের পেছনে ছুটতে গিয়ে নিজেকে কেবল ক্ষত বিক্ষতই করেছেন। সেই মানুষটাই, পিতৃস্নেহে তাকে মানুষ করেছেন, ভালবাসা দিয়ে বড় করেছেন।

আরও একজনের কথা সে ভাবেনি। তার শিউলিমাসী। এরা তার কেউ নয়। কোন রক্তের সম্বন্ধও নেই। অথচ মানবিক সম্পর্কে তাকে পৃথিবীর আলোবাতাস ভোগ করার পূর্ণ অধিকার দিয়েছে। বড় অকৃতজ্ঞ সে। একটা কথা তো সত্যি, সে তার জন্মের জন্যে দায়ী নয়। কেউই জন্মের আগে ঠিক করে আসে না সে কোন গর্ভে আশ্রয় নেবে। জন্ম তো একটা প্রসেসের ফল। কার্য কারণ সম্পর্ক। তবু একটা প্রতিজ্ঞা তার মধ্যে রয়ে গিয়েছিল, সেই হঠকারি বাবামার অন্তত একবারের জন্যেও সে দেখা পেতে চায়। তাদের কাছে তার কিছু প্রশ্ন করার আছে।

সময় একসময় অনেক ঘা শুকিয়ে দেয়। ধীরে ধীরে অহনাও নিজেকে ফিরে পেয়েছিল। তারপর একদিন তার মনে হল তার জীবনের নিষ্ঠুর সত্যিটাকে সুমনের কাছে তুলে ধরবে। সুমনকে সে ভালবাসে। সুমনকে ছাড়া নিজের জীবন সে ভাবতেই পারে না। যেদিন সে অকথা কুকথা বলে সুমনকে বিনা দোষে তাড়িয়ে দিয়েছিল, সেদিনের সুমনের সেই করুণ মুখটা মনে পড়লেই এখনও তার বড় কষ্ট হয়।

সুমনের দাদা যেদিন মারা গেল, এক অনিবার্য আকর্ষণে সে নিজে থেকেই গিয়েছিল সুমনের বাড়ি। সুমন তখন বাড়ি ছিল না। তারপর ফিরল অনেক পরে। সুমনকে দেখে বুকের মধ্যে কেমন যেন হুহু করে উঠেছিল। অনেক অনেকদিন পর নিজে থেকেই সে সুমনের সঙ্গে কথা বলেছিল। সম্ভবত তার পর থেকেই অহনার মানসিক পরিবর্তনের সূচনা।

আমায় ডেকেছিলে ?

অহনা নিজের ঘরে বসেছিল নানান ভাবনা নিয়ে। হঠাৎ সুমনের ডাকে মুখ ফেরায়। আগে সুমন হঠাৎ হঠাৎ চলে আসতো। এ ঘরে তার ছিল অবারিত দ্বার। কারো অনুমতি নেবার কোন প্রয়োজনও হ'ত না। আজ ও চৌকাঠের ওপাশে দাঁড়িয়ে ভেতরে আসার অনুমতি চাইছে। খুব খারাপ লাগলো অহনার। চোখে প্রায় জল এসে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে সুমনের একটা হাত চেপে ধরে বলল, আগে তো কোনদিনও জিজ্ঞেস করে আসতে না ?

—কাল আর আজ এক নয় অহনা। তাছাড়া তোমার কাছে

আসতে গেলে পকেটে টাকা নিয়ে আসতে হবে। সেদিন ছিল না। আজ অবশ্য আছে।

—সুমন, আহত স্বরে অহনা বলে, যাকে ভালবাসা যায় তার অপরাধ ক্ষমা করা যায় না? তাকে কী এই ভাবে চাবুক মারতে হয়?

পরম যত্নে সুমনের হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় বসায়। অনেক, অনেকদিন এত কাছে সুমনকে পায়নি। কি যেন হয়ে যায় অহনার। নিজেকে হারিয়ে ফেলে ঝটিতি ওর মুখখানা চেপে ধরে পাগলের মতো চুমু খেতে শুরু করে দেয়।

হকচকিয়ে গিয়েছিল সুমন। দমকা ঝড়কে কোন মতে থামিয়ে ও বলে, পাগলামি কোর না অহনা। বল, কী জন্যে ডেকেছ?

খুব ঘনিষ্ঠ দূরত্বে দাঁড়িয়ে ছিল অহনা। আবেগে তার শরীর কাঁপছিল। বেশ কয়েক মিনিট সময় নিল নিজেকে সামলাতে। তারপর ধীরে ধীরে গিয়ে বসল সামনের চেয়ারে।

দুজনের কেউই কিন্তু কোন কথা বলে উঠতে পারছিল না। সুমন বুঝতে পারছিল না হঠাৎ অহনা তাকে ডেকে পাঠালো কেন? হঠাৎ এত আদরের ঘটাই বা কেন? সেই ভয়ংকর অপমানের দিনটা তো সুমন মনে প্রাণে ভুলতেই চেয়েছে। সামনাসামনি বাড়িতে থেকেও নিজে থেকে আর কোন যোগাযোগ রাখেনি। এরই মধ্যে তার জীবনের গতিপথ অনেক পাল্টে গেছে। কস্তুরীর সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে এখন পর্যন্ত সে অন্য এক সুমন। তার জীবনে এখন অহনাকে বাদ দিয়ে দুটি নারীর প্রভাব ভীষণ ভাবে কাজ করে চলেছে। অহনাকে সে দূর অতীত স্মৃতির মতো ভাবতে চেয়েছে। আর সত্যি কথা বলতে কী, সারাদিনে অনেক ব্যস্ততার মধ্যে অহনার কথা খুবই কম মনে পড়ে। অথবা পড়েও না বলা যায়। দাদার মৃত্যুর দিন সে নিজে থেকে এসে কথা বলেছে। তাও প্রয়োজন এবং ভদ্রতামাফিক। সুমন সত্যিই বুঝতে পারছিল না, অহনার তাকে কী দরকার?

—কী ভাবছ সুমন? হঠাৎ কেন ডেকে পাঠালাম?

—সত্যি কথাটা কিন্তু তাই-ই।

—কেন? তোমায় আমি ডাকতে পারি না? সে অধিকার আমার নেই?

—অধিকার? মনে মনে সুমন হাসে, তারপর বলে, আগে হলে তাই ভাবতাম, কিন্তু আজ সে সব ভাবনা হারিয়ে গেছে।

—এতোই ঠুনকো?

—কী?

—ভালবাসা? একদিন তো এই ঘরে, ঐ খাটের ওপর শুয়ে আমার ঠোঁটে ঠোঁট ছুঁইয়ে বলেছিলে আমার সারা জীবনের ভার তুমি নেবে। ভুলে গেছ?

সুমন চট্ করে কোন উত্তর দেয় না। যদিও তার অনেক কিছু উত্তর দেবার ছিল। একটা সিগারেট ধরিয়ে, একসময় বলে, ওসব কথা থাক অহনা। সেদিন আর আজ এক নয়। এর মধ্যে পৃথিবীর ইতিহাসে আরো অনেকগুলো পাতা যোগ হয়ে গেছে। আরো অনেক কিছু বদলে গেছে।

— কিন্তু একবারও জানতে চাইবে না কেন সেদিন তোমার সঙ্গে ঐ ব্যবহার করেছিলাম?

—কী হবে জেনে?

—কেন, তুমি আমায় ভালবাস না?

—জানিনা অহনা।

—জানিনা মানে?

—ভালবাসা ঠিক কাকে বলে সেটা ঠিক এই মুহূর্তে ব্যাখ্যা করতে পারব না।

—তোমার কথার মানে বুঝতে পারলাম না।

—ঐ যে বললাম বদলের কথা। আমিও, অনেক বদলে গেছি অহনা। যেদিন তোমার ঠোঁটে ঠোঁট রেখে বলেছিলাম তোমার সারাজীবনের ভার আমার, সেদিনের সেই সুমন আর আজকের এই আমি, ঠিক এক নই।

—কী এমন ঘটল যার জন্যে এত হতাশা?

—বললাম না, ভালবাসা ঠিক কী তা আজ আর বুঝতে পারছি না। একদিন মনে হত তোমাকে ছাড়া বাঁচব না। কিন্তু দেখ, বেশ বহাল তবিয়তেই বেঁচে আছি। যেদিন তুমি আমায় তাড়িয়ে দিয়েছিলে সেদিন সারারাত ঘুমোইনি। দু চোখের পাতা কেবলি ভিজে উঠছিল। আর, আজ তোমার কথা মনেই হয় না। একদিন মনে হ'ত তোমার ঐ দেহটা ছাড়া আর অন্য কোন

নারীদেহ আমি স্পর্শ করব না। আসলে তখন খুব সেন্টিমেন্টাল ছিলাম। আজ বুঝতে পারি আবেগটাই সেদিন বেশী কাজ করতো।

—তার মানে আজ তুমি আবেগহীন পশু হয়ে গেছ?

—হ'তে পারে।

হঠাৎ অহনার কী যেন হয়ে যায়। সে ছুটে গিয়ে সুমনের কলার দুটো দুহাতে ধরে প্রবল ঝাঁকুনী দিয়ে বলে ওঠে, না সুমন না, তা হয় না, হ'তে পারে না। আমাকে শাস্তি দেবার জন্যে তুমি নিজেকে শেষ করে দিতে পার না।

আস্তে আস্তে অহনার হাত দুটো ছাড়িয়ে দিয়ে সুমন জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। চকিতে ওর চোখ চলে যায় ওপাশের বারান্দায়। সুনন্দা দাঁড়িয়ে আছে। গালে হাত রেখে। সম্ভবত তারই প্রতীক্ষায়। সরে আসে জানলার কাছ থেকে। অহনা তখন খাটের বাজু আঁকড়ে স্থির দাঁড়িয়ে আছে।

—কী হল, আমার কথার উত্তর দিলে না?

—দেবার মতো উত্তর কিছুই নেই। তবে একটা কথা ঠিক, কাউকে কোন শাস্তি দেবার জন্যে নয়, ঘটনা সব আপনা থেকেই ঘটে যায়। আমরা বলি নিয়তি। আসলে কার্যকারণ সময় আর পরিবেশ মানুষকে নিয়ে নানান রকম খেলা খেলে। সেই খেলায় কেউ কিছু পায় কেউ কিছু হারায়। আমরা দোষ দিই ভাগ্যকে, চেঁচাই নিয়তি নিয়তি বলে। এই তো দেখনা, একদিন কটা টাকার জন্যে তোমার কাছে নয়তো বৌদির কাছে হাত পাততে হত। অথচ,

—হ্যাঁ আমি শুনেছি, এখন তোমার অনেক কাজ, অনেক টাকা। নাম যশও বাড়ছে দিন দিন। তবে, ভেবোনা সেই কারণে তোমাকে আমি ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

অতটা ছোট তোমায় আগেও ভাবিনি, আজও ভাবি না। তাহলে নিশ্চই আসতাম না। আমি এসেছিলাম সত্যিই যদি তোমার কিছু বলার থাকে, তা শুনতে। কেননা তোমার ওপর আর আমার কোন রাগ নেই।

—তাহলে তো আর বলার কোন মানেই হয় না! যেখানে ভালবাসা নেই, রাগ নেই, অনুরাগ নেই, সেখানে আমার কথা

অরণ্যে রোদন ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি দুঃখিত তোমাকে অনেকক্ষণ আটকে রেখে তোমার সময় নষ্ট করলাম। হয়তো কাল ভোরেই তোমার আবার শুটিং। তুমি এসো। বৌদি অনেকক্ষণ তোমার অপেক্ষায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে।

—হুঁ। দাদা চলে যাবার পর সুনন্দা বড় একা হয়ে গেছে। তাহলে সত্যিই তুমি কিছু বলতে চাও না।

- না।

—বেশ। তবে যদি কোনদিন প্রয়োজন মনে করো, আমায় ডেকো। যেখানেই থাকি আসব। কিছু করার থাকলে নিশ্চই করব।

—ধন্যবাদ। কারো করুণা আমার কাছে অসহ্য।

সুমন চলে যায়। আর অহনা! অনেক কষ্টে মনকে বুঝিয়ে যে আগুনটা নিভিয়ে দিতে চেয়েছিল, সেই আগুনটাই আস্তে আস্তে ওকে গ্রাস করতে শুরু করল।

চোদ্দ

ভাগ্য যখন দেয় তখন বোধহয় এমনি করেই দেয়। ভাগ্যে টাগ্যে কোনদিনই সুমনের তেমন বিশ্বাস ছিল না। অলৌকিক কিছুর থেকে ওর বাস্তবটার ওপরই বিশ্বাস বেশী। ও মনে করে কয়েকটা কার্যকারণ যোগাযোগে জীবন এগিয়ে চলেছে। ঠিক জায়গায় টোকা দিতে পারলে আওয়াজ হবেই। আর সেই যোগাযোগের ঠোকাঠুকিতে কস্তুরীর আগমন। পেয়ে গেল কয়েকটা কাজের সুযোগ। সেগুলোও ঠিক জায়গায় ক্লীক্ করে গেল। তারপর ইচ্ছে না থাকলেও হয়ে গেল কস্তুরীর বেড-পার্টনার। কস্তুরীর দেহের খিদে। আর তার কেরিয়ারের খিদে। দুজনেই দুটো খিদে নিয়ে এগিয়ে চলেছে। কিছুক্ষণ আগে অহনা ভালবাসার কথা তুলেছিল। সুমন নিজেও একবার ভেবেছে ভালবাসা কথাটার সঠিক সংজ্ঞা কী? দেহ আর মনের আকর্ষণ? কিন্তু সে খুব ভালো করেই জানে কস্তুরীর সঙ্গে তার মনের কোন সংযোগ নেই। সে অবিবাহিত ছেলে। যুবক। একটি নারী যদি তাকে সব কিছু উজাড় করে দিতে চায়, সেটাও সেই কার্য-

কারণ সম্পর্কের নীট ফল। প্রয়োজন ভিত্তিক লেনদেন। কস্তুরী তার শরীরের মধ্যে থেকে প্রায় শেষ বিকেলের যৌবন ক্ষিদে মিটিয়ে নিচ্ছে। এ নেশাটা যেদিন কেটে যাবে সেদিন কস্তুরী আর এই কস্তুরী থাকবে না। তবে কস্তুরী তার জন্যে অনেক কিছু করেছে। সেটাও ঐ যোগাযোগ। কস্তুরীর সোর্স তাকে বড় বড় কাজ দিচ্ছে। মেগা সিরিয়াল থেকে শুরু করে ইতিমধ্যে তিনটে বড় ছবিতে ও সাইন করেছে। কস্তুরীর অ্যাড ফিল্মে ও রেগুলার মেলমডেল। এ ছাড়াও কস্তুরী নিজে সিরিয়াল প্রোডিউস করতে চলেছে। সেখানেও তার প্রধান চরিত্র। অর্থাৎ কিছু জৈবিক সঙ্গদানে তার কেরিয়ার ওপন। কস্তুরীর নেশা কাটার আগেই তাকে আরো অনেক ওপরে উঠে যেতে হবে।

সুমন মাঝে মাঝে ভাবে, এই কী তার গ্রুপ থিয়েটার করা সমাজ সচেতন নাট্যকারের চরিত্র? কখন আর কবে যেন সেই স্ট্রাগল করার দিনগুলো ভুলে গেছে। ইদানীং ও আর গ্রুপে তেমন যাচ্ছে না। তবে একেবারে ছেড়েও নেই। এখানেও কিন্তু সেই সুবিধাবাদী মনোভাব। একজন অ্যাক্টরের পেছনে গ্রুপ অ্যাক্টরের ছাপ্পা ইণ্ডাস্ট্রিতে বিশেষ সম্মানের জায়গা দেয়। তাই এখন ধরি মাছ না ছুঁই পানি গোছের অবস্থা। অবশ্য এখনই তার নামে গ্রুপ শোয়ের টিকিট বিক্রি বেড়ে গেছে।

সুনন্দা তখনও দাঁড়িয়ে ছিল বারান্দায়। সুমনকে আসতে দেখে ও সরে গেল। সুনন্দা! এও কী আর এক ধরনের হঠকারি যোগাযোগ? দাদাই বা কেন একটি সুন্দরী কমবয়সী মেয়ের প্রেমে পড়ে বিয়ে করবে? কেনই বা বিয়ের দু'তিন বছরের মধ্যে অবধারিত মৃত্যুরোগে পড়বে? আর সুনন্দাই বা কেন দাদা মৃত্যুশয্যায় শুয়ে থাকতে থাকতেই তার প্রতি আকৃষ্ট হবে? সে জানে সুনন্দা তাকে ভালবাসে। কিন্তু কেন?

প্রেম? না কী সিকিওরিটি? সুনন্দা প্রেমের কথা মুখে বলেনা কিন্তু হাবেভাবে জানাতেও পিছপা হয়নি। কী চায় সুনন্দা? তাকে নিয়ে নতুন জীবন? নতুন জীবনের স্বপ্ন ও দেখতেই পারে। কিন্তু তাকে কেন জড়াচ্ছে? সে তো সুনন্দাকে ভালবাসে না। কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারে। সুনন্দা সুন্দরী যুবতী। মাঝে মাঝে রুচিবোধ বিভ্রে করে। মাঝেমাঝে

সেও নিঃসাড়ে প্রলোভিত হয়। এ কী পাপ? পাপের সংজ্ঞা তো তা নয়। সুনন্দার ইচ্ছে সত্ত্বেও সে কোনদিনও কোন দুর্বলতা দেখায়নি। বরং সুনন্দার আগ্রহে সে জল ঢেলে দিয়েছে। সেটাই কী পাপ? পাপ কাকে বলে? সুনন্দার অবদমিত অপ্রাপ্তি আর ভবিষ্যৎ সিকিউরিটি কোন অবলম্বন পেতে চেয়েছিল, চেয়েছিল এমন একজনের কাছ থেকে যার কাছে সে বিশ্বস্ত। যে কোনদিনও তাকে গভীর অন্ধকারে ঠেলে দেবে না।

সুনন্দা বোধহয় একটা বিশ্বাস আঁকড়ে এগিয়ে চলেছে। সুনন্দার অগোচরে, কস্তুরীর সঙ্গে দেহলীলায় হারিয়ে যাবার সময়, সে অনেকবারই ভেবেছে সুনন্দার একটা বিয়ে দেওয়া দরকার। কিন্তু যেই মুহূর্তে নিজের বাড়ি ফেরে সুনন্দা তার শব্দহীন অনুপ্রবেশে তাকে গ্রাস করে চলে। আজকাল ইচ্ছে করেই সে রাত করে বাড়ি ফেরে। সুনন্দাকে এড়িয়ে যাবার জন্যে।

তিনটে মেয়ে। কস্তুরী, সুনন্দা, অহনা। কস্তুরীকে চেনা যায়। সুনন্দার মানসিকতা দুর্বোধ্য নয়। কিন্তু অহনা? নির্মম ঔদাসীন্যে একবার দূরে সরিয়ে দিয়ে আবার কাছে টানতে চাইছে? কী চায় ও? কিছু বলতে চায়? অহনার সব কিছুই ধোঁয়াশায় হারানো আবছা আবছা একটা কিছু। কিন্তু ভালবাসা নয়। ভালবাসলে অনেকদিন আগেই ও নিজে এসে ক্ষমা চাইত। নাঃ অহনাকে সে বুঝতে পারে না।

—কী হল? ভাবলেই চলবে না জামাকাপড় ছাড়তে হবে?

সুনন্দা চা এনে হাতে ধরাতে ধরাতে বলে, শুধু শুটিং করলেই চলবে? তুমি আর নাটক করবে না?

পকেট থেকে সেদিনের রোজগারের টাকাটা সুনন্দার হাতে দিতে দিতে বলে, হ্যাঁ সুনন্দা, আবার পুরোদমে ঝাঁপ দিতে হবে। আসলে এখন হাতে ছবির কাজ অনেক।

—ক বছরের জন্যে ডেট পাওয়া যাবে না?

—ঠাট্টা করছ?

—না, টাকা আনার বহর দেখে ভাবছি।

—টাকা এখন তুমি রোজই পাবে। আমি রোজ-ভিত্তিক কনট্র্যাক্ট করি।

—আচ্ছা, গলায় ঠাট্টার সুর এনে সুনন্দা বলে, এর পর কবে এসে বলবে, সুনন্দা, এই ফ্ল্যাটটা বড়ো ছোট হয়ে আসছে। চল ভালো একটা ফ্ল্যাট দেখে কোথাও চলে যাই।

—তোমার কী ইচ্ছে সারাজীবন এই এক কামরার ঘরে কাটিয়ে দেওয়ার?

—ক্ষতি কী?

—আমি যদি আরো টাকা কামাই, আরো ছবির কাজ পাই, অথবা যদি কখনো বম্বেতে চলে যাই, এই কামরায় তখন কী থাকা সম্ভব?

—কিন্তু আমাকে তো থাকতেই হবে।

—সেকী, তুমি যাবে না? তাহলে আমার টাকাকড়ির হিসেব কে রাখবে?

—ও, তোমার জীবনে আমার প্রয়োজন শুধু তোমার সম্পদের হিসেব রাখার জন্যে?

—এই তো, আবার রাগটাগ শুরু করলে। খেতে দাও। খুব ক্ষিদে পেয়েছে। নতুন কী রেঁধেছ তাই বল।

—খেতে বসলেই টের পাবে।

—বেশ, সারপ্রাইজ? ওয়েল। মা কেমন? ডাক্তার এসেছিল?

—তোমার মা অমর।

—এ কথা কেন বলছ? মা তো তোমায় কোন ডিসটার্ব করে না। যদি বল তাহলে নয় একজন নার্স রেখে দিই।

—কী করবে নার্স এসে? বাথরুম ছাড়া মা তেমন ওঠা বসা করেন না। এ ছাড়া তো মায়ের কোন ঝক্কি আর জ্বালাতন নেই।

—তাহলে ওকথা বললে কেন?

—ঐ জীবনটা কারোরই ভাল লাগার কথা নয়। ঠিক যেমন সুজনের বেলায় মনে হয়েছিল, ওর আর থাকার দরকার নেই। ঠিক তেমনি, আমার মনে হয় তোমার মায়েরও চলে যাওয়া উচিত। আমি খুব খারাপ মেয়ে। পাপী মন, তাই এসব ভাবি।

সুমন আস্তে আস্তে সুনন্দার কাছে এসে তার একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলে, বুঝলে পাগল, একটু আগে আমি

নিজেই ভাবছিলাম আমি কতটা পাপী। কিন্তু দুটো জিনিষ আমার মাথায় আজও ঢোকেনি। কে পাপী আর কে প্রেমিক? অথচ তোমার দাদা এবং মা সম্বন্ধে ভাবনাগুলো রিয়ালিস্টিক। ক্রুড রিয়ালিটি। কিন্তু অনেক দিনের পুরনো কিছু সংস্কার আমাদের বলে দেয়। এ সব পাপ চিন্তা। যারা বলে তারাও ঠিক পাপের সংজ্ঞা জানে না। বলতে পার সুনন্দা, দস্যু রত্নাকর কী পাপী? তিনি তো জীবনে অনেক অপরাধ করেছেন, অনেক লুণ্ঠন করেছেন। অনেক দরিদ্র মানুষের সামান্য অর্থ কেড়ে নিয়েছেন। আবার ধর, একটা মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে নামতে নামতে এক-সময় দেখল তার পায়ের নীচে কোন মাটি নেই, রোজগার করার মতো কোন সংগতি নেই, অথচ তার সংসারে তার মুখ চেয়ে বসে আছে পাঁচ জন প্রাণী। এখন সে যদি কোন ধনী ব্যক্তির অনেক টাকা ডাকাতি করে নিয়ে আসে, পরিবারের ক্ষুধার্ত মানুষগুলোর পেট ভরায়, অথবা নিরুপায় হয়ে পরিবারের সকলকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে নিজেও নিজেকে শেষ করে দেয়, তাহলে কী সেই লোকটাও পাপী?

—তুমি যে ধান ভাঙ্গতে শিবের গীত আরম্ভ করলে! এই বললে ঘুম পাচ্ছে।

—স্যরি ম্যাডাম। কলেজ লাইফে রাজনীতি করতাম, স্ট্রীট কর্নারে বক্তৃতা দিতাম, অভ্যেসটা রয়ে গেছে। যাও তাড়াতাড়ি খাবারটা নিয়ে এসো।

যেতে যেতে সুনন্দা বলে, তোমার একটা বিয়ে করা উচিত।

—কাকে করব?

— অহনাকে করতে পারো। একদিন তো সেই রকমই ইচ্ছে ছিল।

— সেই একদিনটা হারিয়ে গেছে।

—তাহলে আমাকেই কর।

ঝটিতি সুমন চুপ করে যায়। তারপর দূরমনস্কতায় বলে, না সুনন্দা, তাও হয় না।

—লোক লজ্জা না সংস্কার?

—ওসব আমার কোনদিনও ছিলনা। নেইও।

— তাহলে আটকাচ্ছে কোথায়? রুচিতে?

—তোমার মন খারাপ হয়ে যাবে সুনন্দা।

—তবু বল।

—আমি তো তোমায় কোনদিনও সেই চোখে দেখিনি। সেই অর্থে কোনদিনও ভালবাসিনি।

—ভালবাসা? ও গুলোতো তোমার মাথাতেই নেই। তবে তোমার জীবনে একটি মেয়ের দরকার যে তোমায় চিনবে, বুঝবে। নইলে বড় এলোমেয়ে হয়ে যাবে।

সুমন চুপ করে থাকে। এ কথার কীই বা উত্তর হয়। তবু ওর একবার বলতে ইচ্ছে করল, ভালো তো আমি একজনকেই বেসেছিলাম সুনন্দা। কিন্তু সে যে বড় হঠকারী।

—কিন্তু সুমন, ভেজা ভেজা অন্যমনস্ক গলায় সুনন্দা বলে, আমি এখন কী করি? আর তো কাউকে আমি ভালবাসতে পারব না।

পনেরো

খোঁজ পেয়েছিল বনবিহারীর। লোকটা এখনও আসে নিষিদ্ধ পল্লীতে। মাধবী বলে একটা মেয়ের কাছে। খবরটা বাঁকাই দিয়েছিল। তক্কে তক্কে থেকে একদিন শম্ভু ওকে পাকড়াও করল। বনবিহারী তখন গাড়ি থেকে নামছে।

—চিনতে পারেন বাবুজি?

ঈষৎ মদ্যপ। লাল লাল চোখ দুটো তুলে কিছুক্ষণ ঠাহর করার পর বনবিহারী তাকে চিনতে পারে, তুমি শালা শম্ভু না?

—তাহলে চিনেছেন? লেকিন আপনার চেহারা বহুত পাল্টে গেছে।

—হ্যাঁ। বয়েসটা অনেক বেড়েছে। তা তোমাকে তো আর এদিকে দেখিনা।

—ছেড়ে দিয়েছি বাবু। ইয়ে গন্ধা কারবার আর ভালো লাগে না।

—ভালো। তা এখন কী করছ?

—কুছ নেহি। একটা ছেলেকে আমি লেড়কার মতো মানুষ করেছিলুম। এখোন সেই দেখভাল করে।

—হুঃ, বলে বনবিহারী পকেট থেকে পার্স বার করে একটা একশো টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে বলে, একটা মেয়েকে আমি

অনেক দিন ধরে খুঁজে পাচ্ছি না। এখানেই থাকতো। রঙটা শ্যামলা। কিন্তু ভারী সুন্দরী। আর কী তার ঠমক ছিল। তুমিই প্রথম তার কাছে আমায় নিয়ে গিয়েছিলে!

—মালুম আছে বাবুজি। আপনি শিউলি দিদির কথা বলছেন?

—হ্যাঁ শিউলি। তোমাকে দেখে তার কথা মনে পড়ে গেল। তাকে বড় দেখতে ইচ্ছে করে। মেয়েটা বড়ো ভালো ছিল। মনটাও খুব ভালো।

—বাবুজি, গোস্তাফি মাফ করেন তো একটা কথা বলি। আপনি সায়েদ শিউলি দিদির সাথে মোহাব্বতে আটকে গিয়েছিলেন।

—মহব্বত? জানিনা! সে যখন এখানে থাকতো তাকে ছাড়া আর কারো কাছেই আমি যেতাম না। তার জন্যে মনটা বড় আনচান করে।

বনমালি গাড়ি থেকে নামতে নামতে একটা সিগারেট ধরিয়ে একপা এগিয়েই ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, ভালো কথা, মনে পড়ে গেল, একটা আঁতুড়ে মেয়েকে একদিন তোমার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলাম মেয়েটাকে রেন্ডি বানাতে হবে। তার জন্যে তোমাকে সেদিন পাঁচ হাজার টাকাও দিয়াছিলাম, সে মেয়ে এখন কোন্ ঘরে আছে?

চকিতে শম্ভু কিছু ভেবে নিয়ে বলে, আপনি তাকে দেখতে চান্?

—চাই। আমাকে তার কাছে নিয়ে চল।

—লেকিন বাবুজি, সে তো ইখানে থাকে না।

—যে চুলোয় থাকুক, তাকে আমার চাই। কবে নিয়ে যাবে?

—যব আপনার দিল চাইবে। লেকিন বাবুজি তার উমর তো আপনার থেকে বহুত কম। বিলকুল নাদান লেড়কি।

—চপ রাস্কেল, সেটা আমি বুঝব। কবে নিয়ে যাবে তাই বল। কাল? পরশু?

—পরশু কিউঁ। কালই চলেন।

বনবিহারীর দেওয়া টাকাটা পকেটে ঢুকিয়ে স্থান এবং সময় নির্দিষ্ট করেই শম্ভু ছুটে গেল শিউলির বাড়ি।

—দিদিজি, আপনার মঞ্জিল এবার পুরা হ'য়ে যাবে। বনবিহারীবাবুর পাত্তা লাগিয়েছি। সে বাবুকে কাল আপনার কোঠিতে নিয়ে আসব।

—কাল?

—হাঁ জি। লেকিন বনবিহারীবাবু তো অহনা দিদিকে খুঁজছে।

—সে ব্যবস্থা আমিই করব। কিন্তু এখানে আসবে লোকটা? এখানে সব গেরস্ত আর ভদ্রলোকেরা থাকে।

—আপ ঠিক রহেনেসে ও বাবু কুছু করতে পারবে না।

—তুমি জানো না শম্ভু, লোকটা একসময় পশু হয়ে যায়। তখন ও কিছুই মানতে চায় না।

—আভি উনকা ওমর য্যাদা হয়ে গেছে, লেকিন আপনার কাম তো হাসিল করতেই হবে। অহনা দিদির মুখ চেয়ে আপনাকে কুছ না কুছ তো করনাই পড়েগা। একটা কাম আপনাকে করতে হবে। বনবিহারীবাবু এখনো সরাব পিতা হ্যায়। বহুত বড়িয়া দেখকে একটা বোতল আমি লিয়ে আসবো। তার পরের কামটা আপনাকেই করতে হোবে।

—কিন্তু একবার যদি আমার এই আস্তানার সন্ধান পায়, তখন তো যখন তখন এসে হাজির হবে। তুমি জানোনা, এখানকার লোকেরা আমায় কত সম্মান করে। কেউ দিদি বলে কেউ কাকী, কেউ জেঠি। সব সম্মান মাটিতে মিশে যাবে। আচ্ছা অন্য কোথাও ব্যবস্থা করলে হয়না।

—হোবে। কিন্তু চারপাঁচদিন দের হয়ে যাবে। আজকার মোকাম পাওয়া বহুত মুসিব্বতের বিপার। আউর, সুযোগ একবার হাত ছাড়া হলে, ফিন্ তাকে কাছে আনা বহুত তকলিফকা কাম।

—ঠিক আছে। নিয়েই এসো।

—আপনি কুছ্ চিন্তা করবেন না দিদি। আমি সোব ম্যানেজ করিয়ে দোব।

বনবিহারী এল। আগের থেকে একটু মোটা হয়েছে। রঙেও জেল্লা ফিরেছে। আগে চশমা ছিলনা। এখন সোনালী ফ্রেমের দামী চশমা। গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী। চুনোটকরা ধুতি। হাতে চারপাঁচটা মণিমুক্তো লাগানো সোনার আংটি। সম্ভবত

লোকটা নিজের গাড়িতেই এসেছে। জুতোয় একফোঁটা কাদার দাগও লাগেনি। এখনও সেই ডান পা টেনে টেনে হাঁটছে।

শিউলি আশ্চর্য হচ্ছিল, হঠাৎ লোকটা কী টাকার খনি খুঁজে পেয়েছে। আগের সেই বনবিহারী, ব্যবসা করলেও মনে হতনা খুব একটা দরের কেউ। উপরি রোজগার ছিল। সেই সব রোজগারের অর্ধেকটাই চলে যেতো শিউলির বাক্সে। তবে সেই বনবিহারী ছিল বড় সাদামাটা। কী রুচিতে কী পোষাক আষাকে।

উঠোনে দাঁড়িয়ে শিউলিকে বেশ কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করতে করতে বন বিহারী বলে, বুড়ি হয়ে গেলে শিউলি?

--বয়েস বাড়লে মেয়েরা হয় বুড়ি আর ছেলেরা বুড়ো। আসুন, বুড়োকে কী আর আগের মতো খাতির করতে পারব?

হা হা শব্দে বনবিহারী হেসে উঠে বলে, বদলা নিলে? নাও। ভুলতো কিছু বলনি। বয়েস তো আমারও হয়েছে। কিন্তু, একী ঘর? ছোট্ট একতলার টিনের চালা। কোথায় গেল তোমার সেই সাজানো সংসার?

—এটাই আমার সংসার। সেটা তো মায়ফিল খানা। সেই সব ঝকঝকে আর চকচকে ফ্যাসানদার ঘর না থাকলে কী সেদিন আপনার শিউলিকে মনে ধরতো?

—হ্যাঁ, অতি সাধারণ চাদরপাতা নড়বড়ে খাটটায় বসতে বসতে বনবিহারী বলে, সেদিন যদি তোমার ঘরটা এই রকম অবস্থায় থাকতো তাহলে হয়তো শিউলির কাছে আমার কোনোদিনও যাওয়া হ'ত না। আমি আবার একটু সৌখিন মেজাজের লোক।

—তাহলে আজ আপনাকে ফিরেই যেতে হচ্ছে।

- কেন?

—আপনার মতো মানুষের পক্ষে কী এই গরীবখানা মানায়?

--না শিউলি, সেদিনের সেই উড়ু উড়ু মনটা পাল্টে গেছে। এখন মনে হয় বাইরের থেকে ভেতরের রূপটাই আসল। ঐ যে বললাম, বয়েস। ওটাই এসব শেখায়।

কিন্তু এখনো তো আপনি ও পাড়ায় যান। কচি মেয়েদের উপর লোভতো যায়নি এখনো।

বনবিহারী হাসে, তারপর বলে, না, ঠিক তা নয়। তবে বুড়িদের থেকে কচিরা অনেক প্রাণবন্ত। তাদের উদ্দাম আর চাঞ্চল্যগুলো বেশ লাগে। তাছাড়া তুমি তো জানো, আমি ব্যাচেলার মানুষ। খারাপ রাস্তায় অনেক দুনম্বরী রোজগার। টাকাও আমার অনেক। কী করব অত টাকা দিয়ে? কিছুটা খরচ করি ও পাড়ায় গিয়ে। মেয়েরাও কিছু পায় আর আমারও নিঃসঙ্গ রাত রঙীন মজায় কেটে যায়। না, এর জন্যে আমার কোন আফশোষ নেই।

—তাহলে একটা মরা বুড়ির কাছে এলেন কেন? আপনার নিঃসঙ্গতা তো দূর করার ক্ষমতা আজ আমার নেই।

বনবিহারী ফের হা হা শব্দে হাসির লহর তুলে বলে, একটা কথা নিশ্চই জানো, মরা হাতির দাম লাখ টাকা। এখন অবশ্য লাখে কুলোয় না। এসো শিউলি, একটু কাছে এসো। তোমাকে একটু ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে। তোমার সেই তাপ আজ কতটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে সেটাই শুধু পরখ করতে চাই।

মুহূর্তে শিউলির চোখ দুটো জ্বলে উঠে। কিন্তু একটা গোপনসত্য গোপনই থেকে যাবে যদি এই লোকটা রাগটাগ দেখিয়ে এখান থেকে চলে যায়। রাগটা সরিয়ে শিউলি বলে, সেই সব ইচ্ছে টিচ্ছে গুলো এখনও আসে?

—ওই যে বললাম, আমি বড় একা। থাকবে আমার সঙ্গে, বাকী জীবনটা? বিশ্বাস কর, তাহলে আর কোনদিনও ওই নোংরা পাড়ায় যাব না।

—কিন্তু শিউলি ছাড়াও আরো অনেক মেয়ে আপনার জীবনে এসেছে। এখনও আছে।

—তবু তারা কেউ শিউলি নয়।

—এ আপনার আবেগের কথা। দূর থেকে সব জিনিষকেই সুন্দর লাগে, কিন্তু বেশীদিন তাকে কাছে পেলে তার সব রূপ আর জৌলুস ফিকে হয়ে সে নিতান্তই সাধারণ আর আটপৌরে হয়ে যায়। তখন আর আমাকে ভালোই লাগবে না।

—তাই যদি হয়, তাহলেও, তোমার তো হারাবার কিছু নেই শিউলি। আবার ফিরে আসবে তোমার এই ছোট্ট ঘরে।

—হ্যাঁ ফিরে আসব, নিয়ে আসব তিক্ত কিছু অভিজ্ঞতা। সেটা তো সহ্য হবে না! যাক সে কথা, অনেক দিনের একটা পুরনো না

খোলা হুইস্কির বোতল এখনও রয়ে গেছে। অরুচি নেই তো ?

—অমৃতে অরুচি ? কী যে বল ? কিন্তু আমায় জন্যে পুরনো দামী বোতল খুলবে ? কেন শিউলি ?

—জানিনা। হয়তো, অনেকদিন একটা মানুষকে শরীর দিতে দিতে তার ওপর কিছু মায়া পড়ে যায়। তাছাড়া আপনি না এলে ওটা অমনিই পড়ে থাকতো। কেই বা খায় ?

—তুমি যেন কী বললে ? মায়া ? ভালবাসা নয় ?

—বেশ্যাদের ভালবাসতে নেই। বসুন, আমি গ্লাস আর বোতল নিয়ে আসি।

তারপর রাত অনেক গভীর হল। একটা নয়, বনবিহারীর সঙ্গে আনা আরো একটা বোতল যখন আধা শেষের মুখে, তখন বনবিহারীর কথার বাঁধন আলগা হয়ে গেছে। রীতিমত ভুল বকার স্টেজে। তারই ফাঁকে মোক্ষম প্রশ্নটা করে ফেলল শিউলি, আচ্ছা বনবিহারীবাবু তুমি তো আমায় এতক্ষণ ধরে বললে তুমি আমায় আজও ভালবাস, তাই আমার ঘরে এসেছ।

—আলবৎ।

· জানো তো, ভালবাসার মানুষের কাছে কিছু লুকোতে নেই।

—আমি তো শালা তোমার কাছে কিছু গোপন করিনি।

—করেছ। অবশ্য আমারও কিছু দোষ আছে। প্রশ্নটা এর আগে তো আমিও করিনি।

—প্রশ্নটা কী ?

-- আজ থেকে তেইশ বছর আগে,

মদ্যপ বনবিহারী তার শিথিল হাত দুটো কোনমতে তুলে বলে, আমার মনে নেই বাবা তেইশ বছর আগে দুনিয়ায় কী কী ঘটে ছিল।

—আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি। মনে পড়ে, সবে জন্মেছে একটা কচি বাচচাকে তুমি শম্ভু দালালের হাতে তুলে দিয়েছিলে।

হঠাৎ নেশায় চিড় ধরে বনবিহারীর। জঘন্য ভাষায় চিৎকার করে ওঠে, শালা, হারামিকা আওলাদ শম্ভু, ও শালার আজ আমাকে সেই কচি মেয়েটার কাছে নিয়ে যাবার কথা ছিল। তো কিনা নিয়ে এল তোমার ঘরে ? কোথায়, শম্ভু কোথায় ? সেই

মেয়েটাই বা কোথায় ?

—অযথা শম্ভুর ওপর রাগ করছ বনবিহারীবাবু! আমার কাছে এসে কী তোমার আফশোষ হচ্ছে ?

—না আফশোষ নয়। কিন্তু সেই মেয়েটাকে আমার দরকার। অন্য কারণে।

—কারণটা আমায় বলা যায় না ?

—না যাবার কী আছে ? মেয়েটাকে আমি আর একটা বেশ্যা তৈরী করতে চাই।

—ছিঃ বনবিহারীবাবু। তুমি এত নীচ হতে পার তা আমার কল্পনায় ছিল না। একটা নিষ্পাপ ফুলের মতো মেয়েকে তুমি খারাপ করে দিতে চাইছ ?

—ইয়েস, আমি তাই চাই। আর, বহুদিন তো আমার সঙ্গে রাত্রিবাস করেছ, জানো না আমি কত নীচ ?

—এতোটা জানতুম না। কিন্তু কেন ? কি অপরাধ করেছে মেয়েটা তোমার কাছে ?

—মেয়েটা নয়, মেয়েটার মা করেছে।

—কে ? কে ওর মা ? তুমি জান তাকে ?

—হ্যাঁ জানি। খুব ভালো করে জানি। শালী একদিন আমায় খুব রোয়াব দেখিয়েছিল। কী, না, বড়লোকের সুন্দরী মেয়ে। বুঝলে শিউলি, তুমি একটু আগে আমায় বললে, আমি নীচ। তুমি আমায় জানো, মাতাল আর লম্পট বলে। কিন্তু জানো না কেন আমি তোমাদের নিয়ে থাকি। কারণ তোমরা বেশ্যারা বেইমান নও। রূপের দেমাকে ধরাকে সরাজ্ঞান করো না। তোমাদের একটা চরিত্র আছে। টাকা পেলে তোমরা খুশি। টাকা পেলে তোমরা কাউকে কদাকার বলে অপমান করো না। কাউকে ফিরিয়ে দাও না। কিন্তু বড়লোকের সেই সুন্দরী মেয়েটি ? হাই স্যোসাইটির দেমাক। শালী ঐ বয়েসেই একটার পর একটা ছেলের মাথা খেয়েছে। চোখের ঝলকে বাঁদর নাচ নাচিয়েছে। আমার অপরাধ আমি সেই সুন্দরীটির প্রেমে পড়েছিলুম। সামনা সামনি গিয়ে বলেছিলুম তাকে আমি ভালবাসি। তাকে আমি বিয়ে করব। ব্যস, শালী পায়ের চটি খুলে আমার গালে সপাটে মেরে বলেছিল, 'আয়নায় নিজের

মুখটা একবার দেখে এসো। আর তোমার মনিব মানে আমার বাবাকে জিজ্ঞেস কোর কতটাকা তুমি মাইনে পাও।'

বনবিহারীর সত্যিই নেশা হয়েছিল। নেশার ঝোঁকে আরো অনেক কিছুই বলে ফেলল। বনবিহারী প্রতিশোধ নিতে চায়। সে চায় সেই দেমাকী সুন্দরীর আসল চেহারাটা সবাইকে চিনিয়ে দিতে।

—কিন্তু, শিউলি জিজ্ঞাসা করে, তোমার ঐ সুন্দরী প্রেমিকাটির সঙ্গে অহনার কী সম্পর্ক?

–আরে, ঐ মাগীটাই তো, কি নাম বললে, অহনা, বেড়ে নাম, অহনার মা।

—তার মানে?

কুমারী অবস্থায় পেট বাঁধিয়েছিল। ওর বাপের ইচ্ছে ছিল খসিয়ে দিতে। কিন্তু যখন জানাজানি হল তখন অনেক লেট। পেট খসাতে গেলে সুন্দরীটি টেঁসে যেত। শালী বড় ঘরের খানকী তো···

—আঃ বনবিহারীবাবু, তোমার মুখ খারাপ করা রোগটা আজও গেল না। তারপর কী হল বল?

– কী আর হবে? গভ্ভো ক্লীয়ার না হওয়া পর্যন্ত গৃহবন্দী। তারপর যেদিন মেয়েটা হল, আমার মালিক শ্রী শোভনসুন্দর বাঁড়ুজ্যে, অনেক টাকার মালিক, আমাকে, মানে তাঁর একান্ত অনুগত ভৃত্যটির হাতে হাজার পাঁচিশ টাকা গুঁজে দিয়ে বলেছিল বাচ্চাটাকে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসতে, জ্যান্ত। আর এসব কথা কাউকে না জানাতে।

—তা তুমি তাকে বাঁচালে কেন?

–না, বাঁচাবো কেন? শম্ভুর হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলাম মেয়েটাকে বেশ্যা তৈরী করতে। তারপর সেই বেশ্যাটাকে নিয়ে গিয়ে হাজির হতাম বড়লোক খানকিটার সামনে, গিয়ে বলতাম খানকির মেয়ে খানকিই হয়।

—সেই মা-টি এখন থাকে কোথায়?

–তা বলতে পারব না, তবে শুনেছিলাম প্রায় বাপের বয়েসী একটা লোকের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল।

—তারও নাম ঠিকানা জানো না?

—পাওয়া যাবে। শোভনসুন্দর বাঁড়ুজ্যে এখনো বেঁচে আছে।

—কিন্তু প্রমান করাবো কী করে যে ফেলে দেওয়া সেই মেয়েটিই অহনা। তার ওপর শোভনসুন্দর বাবু একজন ধনী লোক।

বুড়ো আঙ্গুলটা ওপর দিকে তুলে বনবিহারী বলে, ছাই। বনবিহারী দত্ত তার ষষ্ঠিপুজো করে দিয়েছে।

—কি রকম?

—লোভী বুড়োর দুতিনটে ব্যবসায় খাঁই মিটছিল না। আরো টাকা, আরো ধনী হবার নেশায় পেয়ে বসেছিল। বুড়ো আমায় খুব বিশ্বাস করতো। কারণ ব্যবসাপত্তর সব আমিই দেখাশুনো করতুম। ম্যানেজার কাম গৃহভৃত্য। দিলুম শালার বুড়োকে এক নতুন ধরনের বিজনেসে নামিয়ে। কলকাতায় তখন বাড়ির খুব ক্রাইসিস। গিজগিজ করছে জনসংখ্যা, কিন্তু বসত বাড়ি নেই। আর জমির দাম বাড়ছে হু হু করে। শোভনসুন্দরের অনেক ফাঁকা জমি পড়েছিল শহরের মধ্যেই। মাথায় ঢুকিয়ে দিলুম, ঐ জমিতে আকাশ ছোঁয়া বাড়ি তুলে ফ্ল্যাট হিসেবে বিক্রি করে দিন। আবার সেই টাকায় জমি কিনুন। আবার ফ্ল্যাট করে বিক্রি করুন। দেখবেন বছর খানেকের মধ্যে কোটিপতি হয়ে যাবেন। নেমে পড়ল বুড়ো নতুন ব্যবসায়। অন্য অন্য ব্যবসা থেকে টাকা তুলে তৈরী হল মাঙ্গলিক অ্যাপার্টমেণ্ট। নিমেষে ভর্তি হয়ে গেল ফ্ল্যাটগুলো। তারপর একদিন, নিশুতিরাতে ধ্বসে পড়ল মাঙ্গলিক। কয়েকশো লোকের খুনের দায়ে শোভন সুন্দর হল জেলের আসামী।

—তুমি তো তাঁর ম্যানেজার ছিলে তাই না? তোমার হাত দিয়েই তো সব কিছু হয়েছিল?

—কিন্তু খাতায় কলমে শোভনসুন্দর বাঁড়ুজ্যে সব করেছে। তাছাড়া বাড়ি তৈরী হয়ে যাবার ঠিক পরে পরেই তো আমি আর শোভনসুন্দরের চাকর ছিলুম না।

—তুমি একটা শয়তান।

—না, প্রেম, প্রতিহিংসা আর যুদ্ধে অন্যায় বলে কিছু নেই। মহাভারত পড়নি? বাঁড়ুজ্যে গেছে। এবার সেই দেমাকি। আর মোক্ষম অস্ত্র আমার হাতে। কী নাম যেন অহনা। ভারী ভালো নাম।

—অহনার মায়ের নামটা কিন্তু এখনো বলনি।

—তোমাকে জানিয়ে কী লাভ?

—লাভ লোকসান ছাড়া জগতে তুমি আর কিছু চেনো না?

—না, কারণ আমি ব্যবসাদার লোক।

—আমাকে জানালে তোমার লাভই হত।

—কী রকম?

—তোমার ইচ্ছে মত অহনা হয়ত আজ খারাপ মেয়ে হয়ে যায়নি। কিন্তু সে বুদ্ধিমতী, লেখাপড়া জানা মেয়ে। সে তার মায়ের সামনে গিয়ে কৈফিয়ৎ আদায় করতে পারতো।

—তাতে কী আমার জুতো খাওয়া গালের দাগটা মিলিয়ে যেত?

প্রতিশোধ অনেক ভাবেই নেওয়া যায় বনবিহারীবাবু। মাঝে মাঝে আঙুল বেঁকিয়ে ঘি তুলতে হয়। তোমার কথামতো অহনার মা খুব খারাপ মেয়ে। তা সেই খারাপ মা যখন দেখবে তার আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেওয়া মেয়েটা, অত্যন্ত ভালো মেয়ে হয়ে তার সামনে দাঁড়িয়েছে। সেটা তাঁর পক্ষে সুখের হবে আর শিক্ষারও হবে। অনুতাপ আর আফশোসে মহিলা তখন নিজের হাত কামড়াবেন। মাথায় কিছু ঢুকল? অহনার মায়ের নামটা বল।

—কি হিজিবিজ করে বলে গেলে, কিছুই বুঝলুম না। মরুক গে, তার নাম কস্তুরী বাঁড়ুয্যে! এখন কী টাইটেল কে জানে!

—অহনার বাবার নাম?

—কস্তুরী মাগী হয়তো নিজেই জানে না। শোভন বাঁড়ুজ্যেকে জিজ্ঞাসা কোর।

—শোভনবাবুর ঠিকানা?

—যথা সময়েই পাবে। এখন এসো। আমার বুকের জ্বালাটা কমাও। কিছু পেতে গেলে কিছু যে দিতে হয়, এটা তো তুমি ভালোই জানো।

—কিন্তু আমি তো বুড়ি হয়ে গেছি।

শিউলিকে বুকের মধ্যে সাপটে নিয়ে বনবিহারী বলে, প্রেম পুরনো হলেও বৃদ্ধ হয় না। পুরনো মদ, তার স্বাদই আলাদা। শিউলি, আমি এবার শোব, তোমার কোলটা পাত না মাইরি।

কোল পাতার অপেক্ষা করার অবসর থাকে না। ওই অবস্থাতেই শিউলিকে জড়িয়ে মড়িয়ে মরা মাছের মতো কাত হয়ে যায়।

।। ষোল ।।

—তুমি কে মা? তোমায় তো ঠিক চিনতে পারলাম না।

অতি কষ্টে ঠোঁটের একপাশ দিয়ে শব্দগুলো কোনমতে ভাসিয়ে দিচ্ছিলেন স্থবির, অথর্ব, পঙ্গু শোভনসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়। এককালের ঐশ্বর্যবান অহংকারী মানুষটা বনবিহারী দত্তের চাতুর্যে নিমেষে ফতুর হয়ে গেছেন। সিভিয়ার স্ট্রোকে প্রাণে বাঁচলেও একটা দিক পড়ে গেছে। জেলে থাকতেই। জেল কর্তৃপক্ষ নিজেদের দায় এড়িয়ে তাঁকে খালাস করে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে, প্রতিমুহূর্তেই তিনি মৃত্যুর প্রহর গুণে চলেছেন। বসতবাড়িটা কোনমতে রক্ষা পেয়েছিল কস্তুরীর দৌলতে। দেখভালের জন্যে আছে দিনরাতের একটি মেয়ে। খরচ আসে কস্তুরীর কাছ থেকেই। একজন নার্সকেও রাখা হয়েছে। নার্সটি দাঁড়িয়েছিল পাশেই।

বেশী কথা বললেই মুখের পাশ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ে। প্রায় আসবাবহীন ঘরের দেয়ালে যুবক শোভনসুন্দরের মস্ত হাফ বাস্ট। দেখলেই মনে হয় এককালে ভদ্রলোকের জৌলুস ছিল। আভিজাত্য ছিল। অর্থ ছিল। ছিল প্রতিষ্ঠিত এক মানুষের তৃপ্তি। কিন্তু এখন প্রায় প্রেত চেহারায় পুরনো দিনকে যেন ব্যঙ্গ করছেন।

—আমাকে আপনি চিনবেন বাবা। আমার নাম শিউলি।

—কে শিউলি?

চট্ করে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শিউলির পক্ষে সম্ভব হয় না। তার একপাশে অবনীমোহন। অন্যপাশে অহনা। শিউলির উত্তর না দিতে পারা অস্বস্তির গুমোট কাটিয়ে অবনীমোহনই এগিয়ে যান, আমার বান্ধবী। জীবনে অনেক পোড় খাওয়া একটি মেয়ে।

—হুঁ। কিন্তু আপনি?

—আমিও এক নগন্য মানুষ। অবনীমোহন সেন। পোড়া

তুবড়ির খোল দেখেছেন। সেই রকমই। জীবনের নর্দমায় পরিত্যক্ত এক তুবড়ির খোল।

—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আজকাল কেউ আর আমার কাছে আসে না। আসবেও না। আইনের চোখে আমি এক ঘৃণিত আসামী। খুনী।

—আমরা আপনার কথা সব জানি। আর সব জেনেই এসেছি। আপনার একটু সাহায্য পেতে।

যে নিজেই মৃতপ্রায়, চলচ্ছক্তিহীন তার সাহায্যের হাত তো বেশীদূর প্রসারিত হতে পারে না।

—তবু, আপনার একটি ছোট্ট সত্যি কথা একজনকে জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারে।

—কিন্তু আমি এক পাপী নরপশু। আমার লোভ, মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, পরিণাম শয্যায় শুয়ে থাকা এক প্যারালেটিক পেসেণ্ট। জানেন অবনীবাবু, স্বর্গ নরক এখানেই। এখন আমার নরকবাস। অনেক পাপের প্রায়শ্চিত্য করে চলেছি।

—কিন্তু, এবার শিউলি বলে, আমি জানি আপনি যা করতে চেয়েছিলেন তাতে মানুষের ভালো হত। দুর্ঘটনার ওপর কারো তো কোন হাত থাকে না।

—কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটায় এই হাত। কখনো স্বেচ্ছায় কখনও অনিচ্ছায়। আর ভালো? হয়নি। একটা তাসের ঘর তৈরী করে ছিলাম। একটু বাতাসেই তা চুরমার হয়ে গেছে। আর নিয়ে গেছে অনেক তাজা প্রাণ। ভাবলেই আমি শিউরে উঠি।

—তার জন্যে কিন্তু আপনি দায়ী নন।

আইন তা বলেনি। খাতায় কলমে মাঙ্গলিকের মালিক আমি। যে মঙ্গল করতে চেয়েছিলাম, তাতে মঙ্গলের কিছু ছিল না। ছিল শয়তানের উল্লাস।

—তবু আমি জানি এর জন্যে আপনি দায়ী নন।

—সে আমিও জানি। আমার চলার কোন ক্ষমতা থাকলে স্কাউণ্ড্রেল বনবিহারীকে ধরে নিয়ে এসে গুলি করতাম। কিন্তু এ জীবনে তা আর সম্ভব হল না। যাক ওসব কথা। এখন বলুন এই পঙ্গু লোকটা আপনাদের কী উপকার করতে পারে।

—আমাদের উপকার নয়। আপনার একটি সত্যভাষণ এই

ছোট্ট মেয়েটির জীবনের অনেক কলঙ্ক কেড়ে নিতে পারে।

—কলঙ্ক? কোন মতে ঘাড়টা একটু সোজা করে শোভনসুন্দর বলেন, এই মেয়েটি, কিসের কলঙ্ক?

অহনা এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বৃদ্ধ মানুষটিকে লক্ষ করছিল। এবার সেই এগিয়ে গিয়ে বলে, এ কলঙ্ক আমার নয়। আর সে জন্যে আসিওনি। আমি শুধু খুঁজে পেতে চাই আমার চোখে কলঙ্কিত আর পাপী একটি নারী আর একটি পুরুষকে।

—তারা কে মা? তুমিই বা কে?

—তার আগে বলুন, আজ থেকে তেইশ বছর আগে এই বাড়িতেই একটি শিশুর জন্ম হয়েছিল। অবৈধ শিশুর। তা কী সত্যি?

শোভনসুন্দরের দৃষ্টির অভিব্যক্তি তেমন জোরালো নয়। তবু বিস্ফোরণটা বোঝা যায়। সেই বিস্ফোরিত চোখে অহনার দিকে তাকিয়ে জড়ানো স্বরে শোভনসুন্দর জিজ্ঞাসা করেন, এ কথা তুমি জানলে কেমন করে মা?

—তার আগে বলুন, এ কী সত্যি?

শোভনসুন্দর হঠাৎ চুপ করে যান। বোধহয় কথা বলতে তার অসুবিধা বা কষ্ট হচ্ছিল। বুকের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসও একটু বেশী মাত্রায় ওঠানামা করছিল। সঙ্গে সঙ্গে নার্স মেয়েটি পাল্‌স তুলে পরীক্ষা করে। তারপর হাতটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বলে, ওনার বেশী উত্তেজিত হওয়া বারণ। আপনারা বরং কাল আসুন।

—না। চাপা অনুচ্চস্বরে হলেও তার ডিটারমিনেশানটা কতটা স্ট্রং তা বোঝা যায় ঐ একটি 'না' উচ্চারণে। সেই একই তীব্রতায় অহনা বলে, ম্যাক্সিমাম কী হতে পারে? উনি মারা যেতে পারেন। কিন্তু মরতে উনি এত তাড়াতাড়ি পারবেন না। কারণ একটি নির্মম সত্য না প্রকাশ করে উনি মরতে পারেন না।

—তোমার কী প্রশ্ন আছে সেটাই বল। কারণ আমার শরীর কয়েকদিন যাবৎ আরো খারাপ হয়ে আসছে। বল, তুমি কী সত্য জানতে চাও? জানা থাকলে জানিয়েই যেতে চাই।

—তেইশ বছর আগে এ বাড়িতে একটি শিশুর জন্ম হয়েছিল, এ কথা ঠিক?

—হ্যাঁ, ঠিক। কিন্তু তোমার যা বয়েস এ সংবাদ তো তোমার জানার কথা নয়।

—মহাভারত বা রামায়ণ লেখার সময় আমার জন্ম হয়নি। তা বলে কী তখনকার কাহিনীগুলো আমার অজানা।

—বেশ তুমি যেখান থেকেই হোক জেনেছ। কিন্তু সেই কথা জানতে তুমি এত উদগ্রীব কেন?

—কারণ, আপনি স্বীকার না করলেও, এটা সত্য, আমি সেই পরিত্যক্ত শিশু যাকে বনবিহারী বাবুর হাতে তুলে দিয়েছিলেন মেরে ফেলতে, নিজের মেয়েকে বাঁচাবেন বলে।

—বুঝলাম, এটাও বনবিহারীর আর এক নতুন খেলা। তবে বনবিহারীকে বলে দিও, আর নতুন করে কিছুই আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। কিন্তু বনবিহারীর মতো জোচ্চর বেইমান লোকের সঙ্গে তোমাদের আলাপ হল কি করে?

এবার অবনীমোহন বলেন, সে সব অনেক কথা বাঁড়ুজ্যে মশাই। তার আগে বলুন, মেয়েটি যা বলছে তা কী আপনি অস্বীকার করতে পারেন?

কিন্তু সে মেয়ের তো এতদিন বাঁচার কথা নয়।

—সত্যই তাই। শিউলি কথার রেস টেনে নিয়ে বলে, সত্যিই বাঁচার কথা নয়। কারণ আপনি তাকে মেরে ফেলতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু দত্তবাবু তাকে এমন একজনের হাতে দিয়েছিলেন, লোকটা ঐ মহাপাতকের কাজটা করতে পারেনি। তাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন বাঁচাবার জন্যে।

—রাসকেল দত্ত।

—হয়তো সে সত্যিই রাসকেল, অবনী বলেন, সে চেয়েছিল মেয়েটিকে পতিতা করে প্রতিহিংসা নিতে। তাতো হয়নি তবে এটাই ধ্রুবসত্য। অথবা এই মেয়ের নিয়তি। সে বেঁচে আছে। তার দাদামশায়ের সামনে এসে কৈফিয়ৎ চাইছে।

আবার খানিকক্ষণের নীরবতা। তারপর প্রায় স্বগোতোক্তির মতো করে শোভনসুন্দর বলেন, নিয়তি। তা হতে পারে। হয়তো সত্যিই তুমি সেই মেয়ে। অথবা বনবিহারীর নতুন চাল।

—না, এবার অহনাই বলে। এক বৃদ্ধকে মিথ্যে বলে তাকে ব্ল্যাকমেল করার কোন ইচ্ছে আমার নেই। আমি কেবল আমার

জন্মরহস্য জানতে এসেছি। এসেছি আমার সত্যিকার বাবামা'র পরিচয় জানতে।

—আর কী কোন লাভ হ'বে ? নতুন করে কিছু ?

—লাভ লোকসান নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই! নিজেকে আপনার নাতনী সাজিয়ে আপনার অবশিষ্ট সম্পত্তি ভোগের বাসনাও আমার নেই। আমি জানি আপনি আত্মগ্লানিতে জ্বলে যাচ্ছেন। হয়তো আমার কাছে সত্যপ্রকাশ করলে হারানো শান্তি ফিরেও পেতে পারেন।

—কোন লোভেই আর আমি লোভাতুর হব না মা। লোভ কী তা আমার জানা হয়ে গেছে। তবে আমি মনে করি আমার সারা জীবনে যে পাপ জমে আছে, তার কিছুটা শাস্তি হয়তো কমবে। সেই মেয়েটি তুমি কিনা জানিনা, তবে সেই নিষ্পাপ দুধের শিশুটিই আমার একমাত্র মেয়ের অবৈধ সন্তান। আর সেই জন্যেই তাকে আমি পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম।

—আর আমার বাবা ?

—সেটা কস্তুরী কোনদিনও ভাঙেনি। তাই তাকে আমি চিনিনা। হয়তো কস্তুরী সেকথা বলতে পারে।

—কোথায় থাকেন আপনার মেয়ে ?

—তার শ্বশুর বাড়ি সল্ট লেকে।

—ঠিকানা ?

—ঐ টেবিলের ওপর একটা ডায়েরী আছে। ওতেই পাবে কস্তুরী সান্যালের ঠিকানা।

—ধন্যবাদ, বলে অহনা চলে আসছিল। পিছু ডাকলেন শোভনসুন্দর, অবনীবাবু, মেয়েটিকে কী আপনিই লালনপালন করেছিলেন ?

অবনী বলেন, হ্যাঁ, সমাজে ওর বর্তমান পরিচয় ও আমার একমাত্র কন্যা।

—আপনার ভাল হোক। অনেকদিন পর বুকটা বোধ হয় একটু হাল্কা হল।

সতেরো

আজ কোন স্যুটিং ছিল না সুমনের। আসলে ইচ্ছে করেই মাঝে মাঝে এক আধটা দিন নিজের জন্যে রেখে দেয়। সম্প্রতি ওর হাতে একটা বড় সিরিয়াল আর একটা বড়পর্দার কাজ চলছে। দিন পনেরোর মধ্যে কস্তুরী সান্যালের মেগা সিরিয়ালের কাজ শুরু হবে। এখন তারই প্রস্তুতি পর্ব। আর কস্তুরীর সিরিয়াল মানে সুমনের জড়িয়ে থাকা। শুধু নায়ক নয়, অভিনয় নয়, স্ক্রীপট্ লেখা নয়। আরো অনেক দায়িত্বপূর্ণ কাজেও সে ইনভলভ্‌ড্। তাছাড়া ইচ্ছে করেই সে তার হাউসিং কমপ্লেক্স থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখে অন্য সব কাজে ব্যস্ত থাকতে চায়। মনের পুরনো সব ঝাল মিটিয়ে সেই সন্ধ্যায় অহনার কোন কথাবার্তা না শুনেই সে চলে এসেছিল। অহনার জন্যে আজও মনটা খুব খারাপ হয়ে আছে। সে জানে অহনা তাকে ভালবাসে। সেই সন্ধ্যার পর থেকে তার কেবলি মনে হয়েছে হাজার চেষ্টা করলেও অহনাকে কোনদিন ভুলতে পারবে না, আজও একান্ত অবসরে তার সব চিন্তাভাবনায় অহনা জড়িয়ে থাকে। অহনা তাকে কিছু বলতে চেয়েছিল। আদর করে, আবদার করে তার চিরদিনের অহনা তার কাছে ফিরে আসতে চেয়েছিল। বলতে চেয়েছিল কেন সে সেই সন্ধ্যায় সুমনকে নানান কটু কথা বলে চলে যেতে বলেছিল। কিন্তু প্রচণ্ড অভিমানে তার কথা শোনা হয়নি। তারপর থেকে আবার অহনা নিজেকে সরিয়ে ফেলেছে। একবার ভেবেছিল সব মান অভিমান ঝেড়ে ফেলে সে আবার অহনার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। শুধু দাঁড়ানো নয়। চিরদিনের মতো নিজের কাছে নিয়ে আসার বাসনাটুকু কার্যকরী করে ফেলবে। কিন্তু পরক্ষণেই পিছিয়ে আসতে হয়েছে। তার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে দুটি নারী। তার একজনের সঙ্গে অবৈধ দৈহিক সম্পর্কে লিপ্ত। অহনাকে বিয়ে করতে গেলে, কস্তুরীর সঙ্গে তার সমস্ত সম্পর্ককে অহনার কাছে খুলে বলতে হবে। এই রকম একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লুকিয়ে রেখে অহনাকে ঠকাতে সে পারবে না। এবং সব কথা শোনার পর অহনা তাকে গ্রহণ করবে অথবা বর্জন করবে তাও সে জানে না। কারণ

শিক্ষিতা মেয়ে হলেও অহনার মধ্যে কিছু চিরকেলে সংস্কার আছে। অপর একটি মহিলার সঙ্গে দৈহিক অন্তরঙ্গতা, কোন মেয়েই সম্ভবত ক্ষমার দৃষ্টিতে মেনে নেবে না। সম্ভবও না। এর পরিণাম অবিলম্বে তাকে কস্তুরী সাহচর্য পরিত্যাগ করতে হবে। যেটা এই মুহূর্তে প্রায় অসম্ভব। সুমন নিজেও জানে না কস্তুরী তাকে কতটা স্বার্থে অথবা লালসায় বেঁধে ফেলেছে। সে কিন্তু কেবলি একটি নারী দেহের ঘোরে চলেছে তা নয় তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ব্যক্তিগত কেরিয়ারের স্বার্থকেন্দ্রিক সুবিধা আদায়।

অহনার সঙ্গে তার মিলনের পথে আর এক অন্তরায় সুনন্দা। অথচ সুনন্দার সঙ্গে তার না কোন দৈহিক সম্পর্ক না কোন মানসিক আকর্ষণ। দাদার বিধবা হিসেবে নয়, সুনন্দার জন্যে তার চিন্তা অন্য কারণে। সুনন্দা বন্ধু হিসেবে দারুণ। সব কিছু তাকে বিশ্বাস করে বলা যায়। এমন কি তার রোজগারের সবটাকাই সে সুনন্দার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারে। একটা মিষ্টি সম্পর্কই সে পাতাতে চেয়েছিল সুনন্দার সঙ্গে। অনাবিল বন্ধুত্ব। অথচ মেয়েটা তাকে ভালবেসে মরেছে। কিন্তু এটা অসম্ভব। হয়না। সামাজিক বাধা হয়তো কিছু নেই। তবু অহনার চোখের সামনে সে তার দাদার বিধবাকে নিয়ে ঘর বাঁধবে, ভাবতেই সব গোলমাল হয়ে যায়। অথচ সুনন্দা তার ওপর ডিপেণ্ড করে বসে আছে। নিজের বাবার কাছেও ফিরে যাবে না। এমন কি জোর করে অন্য কারো সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। আবার সুনন্দা থাকতে অহনাকে বিয়ে করে ঘরে আনতেও তার বিবেক প্রচণ্ডভাবে কুণ্ঠিত হয়ে পড়ছে। সে জানে এমন কাজ করলে মনে মনে সুনন্দা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

মাঝে কিছুদিন সে প্রচণ্ড মদ্যপ হয়ে বাড়ি ফেরা শুরু করে-ছিল। অহনাকে ভুলে যাওয়া আর সুনন্দাকে এড়িয়ে যাবার জন্যে। কিন্তু সুনন্দার প্রতিবাদহীন অসহায়ত্ব তাকে আবার বিব্রত করেছে। আসলে বিবেক আর অনুভূতিপ্রবণ মনটাই তাকে বড় ঝামেলার মধ্যে ফেলে দেয়। দিচ্ছেও।

আজকাল তার একমাত্র রুটিনমাফিক কাজ ছাড়া আর কিছুই ভালো না। তাকে ঘিরে যে জগত সে জগতে কস্তুরী সান্যালের আধিপত্যই বেশী। নিজেকে সে বোঝায়, অহনা আর সুনন্দা,

দুজনের একজনকে রাখতে হবে, একজনকে ছাড়তে হবে। অথচ সেটাও বড় কঠিন কাজ। তার চেয়ে এই বেশ, শুটিং আর শুটিং। এ এক রোমাঞ্চকর জগৎ। আর বাকী সময়টুকু, অবৈধ হলেও, ক্ষতি কী, কস্তুরীর কাছে থেকে অন্য চাহিদা মিটিয়ে নেওয়া।

সকাল সকালই চলে এসেছিল সুমন। কস্তুরীর সিরিয়ালের স্ক্রীপ্ট্ নিয়ে ওরই বাড়িতে আজ সারাদিন কেটে যাবে। লেখা-লেখি আজকাল আর নিজের বাড়িতে হয় না। আরম্ভ করা নাটকটা আধাআধি জায়গায় এসে আটকে আছে। তার কারণ কস্তুরীর সিরিয়ালের স্ক্রীপ্ট্ লেখা চলছে।

কস্তুরী স্নান করতে গেছে। ততক্ষণে স্ক্রীপ্টের ওপর কাটাছেঁড়া কাজটা করে চলেছিল সুমন। হঠাৎ ডোর বেলের আওয়াজ। ওকে উঠতে হলনা। সুকুমার নামে কাজের লোকটি গিয়ে দরজা খুলে পারলারে যাকে নিয়ে এল তাকে দেখার জন্যে ওর কোন প্রস্তুতিই ছিলনা। শুধু অবাক নয়, চমকও বটে। অহনা। অহনা এসে দাঁড়িয়েছে ঠিক তার সামনের সোফার কাছে। একদিন সেও, যেদিন প্রথম এ বাড়িতে এসেছিল, ঐ খানেই এসে বসেছিল। একই প্রশ্ন সুমন করার আগেই অহনা প্রশ্নটা তার সামনে ফেলল, তুমি, এখানে? আকস্মিক চমকের ঘোরটা তখনও লেগেছিল সুমনের মুখে। সেটাকে পাশ কাটিয়ে ও বলল, হ্যাঁ, মিসেস সান্যালতো আমার বস্। ওঁর কাছেই তো আমার রুজি রোজগার।

—ও, তুমি তো এখন থিয়েটার ছেড়ে টিভি, সিনেমা করতে শুরু করেছ।

—কিন্তু, তুমি, এখানে, প্রশ্নটা না করে পারলনা সুমন।

—ভয় নেই, অভিনেত্রী হবার জন্যে সুযোগ খুঁজতে আসিনি।

—অভিনয় লাইনটা যে তোমার মনঃপুত নয় সেটা আমি জানি। কিন্তু কারণটাতো বলবে, এখানে আসার?

—কেন? তুমি কি আমার অভিভাবক?

—হুঁ। রাগটা এখনও তাহলে যায়নি। দাঁড়িয়ে রইলে কেন বোস।

—যদিও এখানে আমি বসতে আসিনি এবং পারতপক্ষে সেটাকে আমি ঘৃণাই করি, তবু, দাঁড়িয়ে থাকাটা উমেদারিতে আসা বলে মনে হয়। তাই বসছি।

সোফায় বসে অহনা বলে, তোমার বস্ মহিলা কী বাড়িতে আছেন ?

—হ্যাঁ, আছেন। স্নান করতে গেছেন। চা খাবে তো ?

অনেকদিন পর দিনের আলোয় অহনাকে এত কাছ থেকে দেখছে সে। আগের মতোই আছে। টসটসে যৌবন ঘেরা নির্মল সুন্দর মুখ। রঙটাও খুব ভালো। তায় ডিপ্ আলট্রামেরিন ব্লু শাড়িতে আরও ভালো লাগছিল। তবে মুখ থেকে আন্তরিকতার ভাবটা চলে গেছে। চোখ দুটো থেকে রাগ ছিট্কে পড়ছে। বোধহয় সেটা ওরই জন্যে। মনে মনে ভাবে, মেয়েদের কতনা রূপ। এই মেয়েই একদিন, তার প্রতীক্ষায় থাকতে থাকতে, কখনও চপল, কখনও বিষণ্ণ আবার কখনও অনাবিল হাসিতে উচ্ছল হতে ভালবাসতো। এমন কী সেদিনও আদর করে কত চুমুই না খেল। রাগের চেহারাটা এর আগে মাত্র একবারই দেখা হয়েছিল। সেটাই আবার ফিরে এসেছে।

মাথা নীচু করে বসেছিল অহনা। ওর মুখ দেখে সুমনের মনে হল, খুব গভীর কোন চিন্তায় আপাততঃ ও অন্যমনস্ক।

—কই, বললে নাতো ? চা খাবে ?

—বাড়িটাতো তোমার নয়। বসের অনুপস্থিতিতে কী অতিথি আপ্যায়নের দায়িত্বটা তোমার ওপরই আছে ?

সুমন একটু চমকায়। তবে কী তার আর কস্তুরীর ব্যাপারটা অহনার কাছে প্রকাশ হয়ে গেছে। আর সেই কারণেই কী এখানে আসা ? কিন্তু অহনার চরিত্র তো তা নয়। কারো সঙ্গে মনান্তর ঘটলে কোন কারণেই ও উপযাচক হয়ে কিছু প্রশ্ন করতে যায় না। নিজের কোন ব্যাপার থাকলে অভিযোগ যার বিরুদ্ধে তাকেই মুখোমুখি আক্রমণ করে। কিন্তু এতদূর বাড়ি বয়ে এসে সীন তৈরী করা ! নাঃ মিলছে না।

—ওভাবে নিওনা অহনা। চা খাবে কিনা জিজ্ঞাসা করাটা সাধারণ ভদ্রতা। আর এতদিন এ বাড়িতে আসা যাওয়ার সুবাদে ওইটুকু অধিকার নিশ্চই জন্মেছে।

—ভাল। তবে আমি চা খেতে আসিনি। পারলে তোমার বস্কে একবার ডেকে পাঠাও।

ডেকে পাঠাতে হোল না। জামরঙা একটা দারুণ ম্যাক্সিতে

শরীর ঢেকে মেজোনাইন ফ্ল্যাটের শ্বেতপাথরের ছোটছোট সিঁড়ি ভেঙ্গে নীচে নামছিলেন কস্তুরী সান্যাল। যে কোন মানুষকেই স্নান করার পর বেশ তরতাজা দেখায়। রোগীদেরও চেহারায় সাময়িক ফ্রেসনেশ ফিরে আসে। কস্তুরী রীতিমত সুন্দরী এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিলাসী। সমস্ত ঘরটাই মিষ্টি পারফিউমের গন্ধে মাতাল হয়ে উঠছিল। নানান রকম পারফিউম ব্যবহার করাটা কস্তুরীর অন্যতম নেশা। ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা ঘনচুল বাঁধা আছে হলুদ রিবনে। ইদানিং কস্তুরী চশমা নিয়েছে। চোখে বিলিতি সোনালী ফ্রেম।

সুমনের পাশে গা ঘেঁষে বসতে বসতে কস্তুরী জিজ্ঞাসা করে, মেয়েটি কে সুমন? তোমার চেনা কেউ?

শব্দ না করে সুমন ঢোঁক গেলে। এই মুহূর্তে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তার পক্ষে খুবই জটিল। অহনা নিমেষে সুমনকে দেখে নিয়ে বলে, উনি আমার পরিচিত অথবা অপরিচিত, সেটা এখানে কোন ফ্যাক্টর নয়। আমি এসেছি আপনার কাছে। কারো কোন সুপারিশ না নিয়েই।

—সুপারিশ? আই সী। সুমন, মেয়েটির চেহারাটা ভালোই। আমরা তো নতুন মুখ খুঁজছি তাই না?

—হ্যাঁ, তবে, ও অভিনয় টভিনয় করে না।

—তুমি জানলে কী করে? চেনো নাকি?

সুমন মাথা নিচু করে।

—তার মানে চেনো। দলের মেয়ে?

—আমি কিন্তু অভিনয়ের জন্যে আপনার কৃপাপ্রার্থী হয়ে আসিনি। এসেছি ব্যক্তিগত কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে।

—ব্যক্তিগত প্রশ্ন? আমার কাছে? হোয়াই? আহ্যাভ নেভার সিন ইউ বিফোর।

—আপনি ঠিকই বলেছেন মিসেস সান্যাল। আপনি এর আগে আমায় কোনদিন দেখেন নি। অফকোর্স আমিও আপনাকে দেখিনি। যদিও আমি শুনেছি আগে আপনি সিনেমায় অভিনয় টভিনয় করতেন। আমার দুর্ভাগ্য সিনেমা দেখার অভ্যেস আমার নেই।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে, এবার বলুন আপনার ব্যক্তিগত

প্রশ্নটা কী? আমার হাতে কিন্তু খুব কম সময়। সুমন, তুমি মিনিট দশেকের জন্যে পাশের ঘরে গিয়ে আমাদের সিডিউলের ওপর চোখ বোলাও, ইয়াং লেডি, আশা করব এর মধ্যেই আপনার কথা শেষ হয়ে যাবে।

সুমন উঠে পড়েছিল। অহনা একবার সুমনের দিকে তাকিয়ে বলে, নো মিসেস সান্যাল, সুমন এখন কোথাও যেতে পারে না। সব কথাই ওর সামনে হওয়ার প্রয়োজন।

--হোয়াট ডু ইউ মীন, কী যেন নাম বললেন, অহনা, ওয়েল আপনি এসেছেন আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত কথা বলতে, তার মধ্যে সুমনের প্রেজেন্স কেন?

—কারণ ওর সব কিছু শোনা দরকার।

মনে মনে সুমন প্রমাদ গোণে। তবে কী সে যা আশঙ্কা করেছিল, অহনা সেটাই করতে চাইছে? কোনভাবে ও হয়ত জেনে ফেলেছে তার সঙ্গে কস্তুরীর সম্পর্কটা, আর সেই কারণেই কী ফয়সালা করতে এসেছে?

—না না। আগের কথার জের টেনে অহনা বলে, তোমার ওরিড হবার কিছু নেই সুমনবাবু। তোমার নিশ্চই মনে আছে একদিন অকারণে তোমায় কিছু খারাপ কথা বলে আমার বাড়ি থেকে চলে যেতে বলেছিলাম,

অহনাকে বাধা দিয়ে কস্তুরী বলে, আই সী, দ্যাট মীনস্ ইউ হ্যাভ সাম কিথ্ অ্যান্ড কিন রিলেশান উইথ দিস গার্ল! বাট সুমন, ইউ ডিডন্‌ট্ স্যে মী বিভোর। ওয়েল, নাউ স্টার্ট ইয়োর স্টোরি ইয়াং গার্ল।

—বাট দিস ইজ নট স্টোরি। র‍্যাদার ইউ ক্যান স্যে দিস ইজ আ ফ্যাক্ট, আ ট্রু লাইফ স্টোরি। সুমন, তোমাকে ভালোবাসা সত্বেও সেদিন আমার কণ্ঠরোধ হয়ে গিয়েছিল। একটা সত্য কাহিনী শোনার পর। আমার মনে হয়েছিল সে সব শুনলে তুমি হয়তো আমায় ঘৃণা করবে।

—এমন কী কথা অহনা, বা শুনলে আমি তোমায় ঘৃণা করব? তুমি তেমন কিছু করেছ?

—না! ইন ফ্যাক্ট, আমি এই ঘটনার সঙ্গে দুর্ভাগ্যজনিত কারণে জড়িয়ে গেছি।

অহনা একবার শ্যেন দৃষ্টিতে তাকায় কস্তুরী সান্যালের দিকে তারপর বলে, মিসেস সান্যাল, মিস্টার শোভনসুন্দর ব্যানার্জীর নাম নিশ্চই আপনি শুনেছেন ?

—রাবিশ, আপনি যাঁর নাম বললেন তিনি আমার বাবা। তার মানে আপনি আমার বাবার কাছ থেকে এ বাড়ির ঠিকানা পেয়েছেন ?

—হ্যাঁ, ঠিক তাই। নইলে আপনার মতো মহিলার সঙ্গে দেখা হওয়া কী সম্ভব ? তবে আপনার পরিচিত আরো একজনও জেনে ফেলেছে আপনার এই বাড়ির ঠিকানা। তার নাম বনবিহারী দত্ত।

—দ্যাট্ স্কাউণ্ড্রেল বনবিহারী, আ রিয়্যাল বীস্ট্। আপনি তাকে চিনলেন কী করে ? আপনাকে তো দেখে মনে হয় আপনি কোন ভদ্রঘরের মেয়ে। বনবিহারীর সংস্পর্শে আসাটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার।

—কিন্তু ঐ স্কাউণ্ড্রেলটির জন্যেই আমার জীবনের এক অজানা তথ্য জানা হয়ে গেছে।

—সেটি কী ?

—নিশ্চই আপনি অনুমান করতে পারেন।

—না, কারণ বনবিহারীর মতো লম্পট আর দুশ্চরিত্র লোকের সম্বন্ধে আমার কোন কিউরিসিটি নেই। লোকটা শুধু ডিবচ নয় একটা শয়তান, পাক্কা ক্রিমিন্যাল।

—কিন্তু আমি জানতাম উনি আপনার বাবার ম্যানেজার ছিলেন।

—তাহলে এটাও নিশ্চই জানেন ঐ লোকটাই একদিন আমার বাবাকে পথে বসিয়েছে।

—শুধু এই কারণেই এত ঘৃণা, আর কোন কারণ নেই ?

—আছে। স্কাউণ্ড্রেলটা একদিন এসে আমায় প্রোপোজ করেছিল। দ্যাট আগলি নটোরিয়াস ডেভিলটার দুঃসাহস দেখে আমি সেদিন তাকে আমার চটি খুলে মেরেছিলাম। ডোণ্ট আটার এগেন হিজ নেম বিফোর মী।

—কিন্তু ইচ্ছে না থাকলেও, তার কথা আপনাকে যে শুনতেই হবে। মনে রাখবেন, একটি মেয়ের জীবন এবং সম্মানের প্রশ্ন

সেখানে লুকিয়ে আছে। মিসেস সান্যাল, ছোট মুখে বড়ো কথা হয়ে যাচ্ছে। তবু,

—ইয়াং লেডি, আপনি কিন্তু আসল কথায় আসছেন না।

—শুরুটা কোথা থেকে করব তাই ভাবছি। মিসেস সান্যাল আপনি কী মনে করতে পারেন, আজ থেকে ঠিক তেইশ বছর আগে শোভনসুন্দরের বাড়িতে এক অবৈধ সন্তানের জন্ম হয়েছিল।

—ইউ টকেটিভ গার্ল, এসব কথা কে বলেছে আপনাকে? বনবিহারী?

—শুধু সে কেন, আপনার বাবা শোভনসুন্দরও ঐ একই কথা বলেছেন।

—মাই ফাদার হ্যাজ গন ম্যাড।

—তাহলেও কী আপনি সত্যটা অস্বীকার করতে পারেন?

সুমন অনেকক্ষণ নীরবে বসে ছিল। আর থাকতে না পেরে বলে, এসব তুমি কী বলছ অহনা? অবৈধ সন্তান, শোভনসুন্দরের স্বীকৃতি। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

ওর কথায় কর্ণপাত না করে অহনা বলে, মিসেস সান্যাল আপনিও কী কিছু বুঝতে পারছেন না?

—আপনি কী আমায় ব্ল্যাকমেল করতে চাইছেন?

—তার মানে ঘটনাটা সত্য।

কস্তুরী সহসাই চুপ হয়ে যান। তারপর ধীরে ধীরে সোফা ছেড়ে মেজোনাইন সিঁড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ান।

—উত্তর দিন মিসেস সান্যাল।

- এসব জেনে আপনার লাভ?

—তার আগে বলুন কথাটা সত্যি কিনা?

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়ে কস্তুরী বলেন, ইয়েস। দ্যাট ইজ ফ্যাক্ট।

—তারপর সেই বাচ্চাটির কী হয়েছিল জানেন?

—সে সঙ্গে সঙ্গেই মারা হয়েছিল।

—নো, ইটস্ আ লাই। হয় আপনি সত্যিই জানেন না, নয়ত আপনি মিথ্যে কথা বলছেন।

—অহনা, এবার একটু রাগত স্বরেই কস্তুরী বলেন, আমার

জীবন ধারাটাই আলাদা, আমার ফিলজফিটাই অন্য। আমি ফাস্ট লাইফে অভ্যস্ত, কিন্তু মিথ্যে কথা বলতে শিখিনি। কারণ মিথ্যে বলাটার কোন প্রয়োজনই পড়ে না আমার জীবনে। আমি জানতাম বাচ্চাটা সেই রাতেই মারা গেছে।

—বাচ্চাটা কার ?

—আমার। ষোল বছর বয়েসের একটা টেরিফিক ভুল। তখন জীবন সম্বন্ধে কোন বোধই তেমনভাবে ছিল না। প্রমথেশ আমাকে অনেক স্বপ্ন দেখিয়েছিল। অ্যান্ড আই ওয়াজ ওভারহুইলমড্ টু হিজ পার্সোন্যালিটি। টু হিজ ম্যানলি রোমান্টিক ফিগার। ঐ বয়েসে যা হয়, তাই হয়েছিল।

—বাচ্চাটাকে গর্ভে থাকতেই অ্যাবরসান করিয়ে নেননি কেন ?

—বিকজ, আই ওয়াজ দেন টু মাচ সেন্টিমেন্টাল। গর্ভের মধ্যে একটু একটু করে বেড়ে ওঠা ছোট্ট অদেখা শিশুটি আমাকে দুর্বল করে দিয়েছিল। অবাঞ্ছিত হলেও, মাতৃত্ব এক অন্য কিছু।

—এসব আপনি মানেন ?

—মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছি তখন মা হবার বাসনা থাকবেই। আমারও ছিল।

—তাহলে আজও মা হননি কেন ?

—অবান্তর প্রশ্ন। কিন্তু আমি একটা কথা ভেবে পাচ্ছি না, হঠাৎ আপনি এসে আমাকে এসব প্রশ্ন করছেন কেন ? সে অধিকারই বা কে দিল আপানাকে ? আর আমিই বা কেন আপনাকে এসব কথার জবাব দিতে যাব ?

সুমনও তাই ভাবছিল। সে ভাবছিল অহনা তার সীমারেখার বাইরে চলে যাচ্ছে। এটাও যেমন সত্য তেমনি এরকম একটা বিরাট সত্য অহনা জানে অথচ সে জানে না। কস্তুরী তো এসব কথা তাকে কোনদিন বলেনি, অথচ অহনা তা জানে ? কস্তুরী একদিন মা হয়েছিল ? তার ভাবনার মধ্যেই অহনার গলা শোনা যায়, মিসেস সান্যাল, একটু পরে যখন আসল সত্যটা জানবেন, তখন বুঝতে পারবেন আপনাকে এইসব নিতান্তই ব্যক্তিগত প্রশ্ন করার অধিকার আমার আছে কী নেই।

—আপনার এ কথার অর্থ ?

—সেই বাচ্চাটি আজও বেঁচে আছে।

—বেঁচে আছে মানে ?

—মানে, আপনার বাবা সেদিন চাননি বাচ্চাটা বেঁচে থাকুক। অথচ অদৃষ্টের কী পরিহাস, তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও বাচ্চাটা মারা যায় নি। হ্যাঁ, আপনি যা জানেন না এবার সেগুলোই শুনুন। বাচ্চাটা জন্মাবার পর, শোভনসুন্দর তাকে তুলে দিয়ে ছিলেন বনবিহারী দত্তর হাতে। কেন জানেন ?

—জানি না, কারণ নির্দিষ্ট সময়ের পরেও বাচ্চাটা জন্মাচ্ছিল না বলে আমার সিজার হয়। নেচারালি আই ওয়াজ দেন আণ্ডার অ্যানেস্থেটিক কনডিসান।

—সম্ভবত সেটাই হবে। আপনার বাবা সেই অবাঞ্ছিত শিশুর মৃত্যু চেয়েছিলেন। কিন্তু নিজের হাতে তাকে মেরে ফেলতে পারেন নি। সেই কাজটুকু করার জন্যে বনবিহারীকে বেছে নিয়েছিলেন। তার জন্যে বনবিহারীকে অনেক টাকাও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বনবিহারীরা সাপের জাত। সে চেয়েছিল এক ঢিলে দু পাখি মারতে। বাচ্চাটাকে মারার থেকে বাঁচিয়ে রাখাটাই তার পক্ষে লাভ।

—কিসের লাভ ?

—বনবিহারী আপনাকে চেয়েছিল, পায়নি। শোভনসুন্দরও তা চাননি। তাই সে বুদ্ধিবলে শোভনসুন্দরকে সর্বস্বান্ত করেছিল। আর বাচ্চাটাকে তুলে দিয়েছিল নিষিদ্ধ পল্লীর এক দালালের হাতে। তাকে বলেছিল, বাচ্চাটাকে ভবিষ্যতের এক বেশ্যা তৈরী করতে।

—হোয়াট ? চিৎকার করে ওঠেন কস্তুরী। আমার মেয়ে হয়েছিল। অথচ বাবা বলেছিলেন ছেলে হয়েছিল। কিন্তু বনবিহারীর রাগ আমার ওপর, আমার মেয়েতো তার কোন ক্ষতি করেনি।

—বনবিহারী চেয়েছিল সমাজে প্রতিষ্ঠিত কস্তুরী দেবীর মেয়ে সোনাগাছির এক পতিতা এটাই চাওর করতে। আলটিমেটলি আপনাকে হয়তো ব্ল্যাকমেল করতো অথবা আপনার স্টেটাস নিয়ে ছিনিমিনি খেলতো।

—স্কাউণ্ড্রেল, আই ডোণ্ট নো হোয়েদার হি ইজ ডেড অব

অ্যালাইভ। সামনে পেলে তাকে বলতাম, কস্তুরীকে সে চেনে না ।

—কী করতেন আপনি ?

—জানি না সে মেয়েটি এখন কোথায় ? কী তার পরিণতি ? যদি সত্যিই সে প্রস্‌টিটিউট হয়ে থাকে, গিভ মী হার অ্যাড্রেস।

—তারপর ?

—এই আগাগোড়া ডিবচ অ্যাণ্ড হিপোক্রীট্‌ সমাজের মুখে তুড়ি মেরে তাকে তুলে নিয়ে আসতাম। তার পরিচয় হত কস্তুরী সান্যালের মেয়ে।

বিদ্রূপ মাখানো কণ্ঠে অহনা বলে, হ্যাঁ, সিনেমায় এসব নাটকীয় পরিণতি হয় বটে।

—অহনা, তোমায় তুমি করেই বলছি, কারণ তুমি আমার থেকে বয়েসে অনেক ছোট। জীবনের নানান দিক আমার দেখা। তুমি যেটা বললে সিনেমায় নয় বাস্তবে তাই ঘটতো। এই মেকী সমাজটা চলছে টাকায় চাকায়। অ্যাণ্ড আই হ্যাভ মনি। প্লেনটি অব মনিজ। কিচ্ছু না। মাত্র পাঁচটা বছর কনটিনেণ্টে ঘুরিয়ে আনতাম। তখন অনেক বিগ গাইরা এসে বলতো আমার মেয়েকে তারা বিয়ে করবে। কল্পনা নয়। দিস ইজ ফ্যাক্ট। ডু ইউ নো দ্যাট পুওর গার্ল ? মাই ইল্‌ফেটেড গার্ল ? ডু ইউ নো হার অ্যাড্রেস ? সে যেখানেই থাক, ইন এনি ডাস্টবীন, আই মাস্ট কালেক্ট হার।

—কথাগুলো কী নিতান্তই বড়লোকের খেয়াল ? অথবা স্টাণ্ট্‌ দেবার কোন নতুন পক্রিয়া ?

—স্টপ্‌ ইউ ফুল। তুমি জানো না একটি সন্তানের জন্যে আমি কত ব্যাকুল। তুমি জানো না আমার বাবা নিজের হৃত সম্পত্তি ফিরে পাবার জন্যে, আমাকে তুলে দিয়েছিলেন বাবারই বন্ধু মিস্টার সান্যালের কাছে। একটি যুবতী মেয়েকে একটি সন্তান উপহার দেবার কোন ক্ষমতাই যার নেই। আর সব থেকে বড় ট্র্যাজিডি কী জানো, আর কোনদিনও আমি মা হতে পারবো না।

—কেন ?

—আমার শরীর থেকে মা হবার সব সম্ভাবনাকে উপড়ে ফেলে

দেওয়া হয়েছে। হিসটেরেকটমি করতে বাধ্য হয়েছিলেন ডাক্তাররা।

অহনা হঠাৎই নীরব হয়ে যায়। সে এসেছিল তার দাবী আদায় করে নিতে। সে এসেছিল এক নিষ্ঠুর মহিলার স্বীকৃতি আদায় করে নিতে। কিন্তু এই মহিলা তো আজ তারই সামনে দু হাত মেলে ধরেছে প্রার্থনার ভঙ্গীতে। ঠিক এই নাটকীয় মুহূর্তের জন্যে সে মনে মনে প্রস্তুত ছিল না। কস্তুরীর মুখেও কোন কথা ছিল না। তিনি ভাবছিলেন মেয়েটির কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে এক অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে আর তাকে হাহাকার করতে হবে না।

—আচ্ছা মিসেস সান্যাল, সেই প্রমথেশ বাবুটি এখন কোথায় ?

—ঠিক জানি না। তবে শুনেছিলাম, সে মারা গেছে। ক্যানসারে।

আবার এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা নেমে আসে ঘরের মধ্যে। একবার দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে সুমন অহনাকে উদ্দেশ্য করে খুব শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু অহনা, তুমি এত সব কিছু জেনেছ শোভনবাবু আর বনবিহারী বাবুর কাছ থেকে। এর জন্যে তোমাকে অনেক পরিশ্রমও করতে হয়েছে। বাট হোয়াই ? সত্যিই কী তুমি জান সেই মেয়েটি কোথায় আছে ? কেমন আছে ?

কয়েকটা মুহূর্ত নীরবে অতিবাহিত করে অহনা। তারপর অত্যন্ত শান্ত আর শীতল কণ্ঠে বলে, সে ভালো আছে। এক পবিত্র পতিতা তাকে তুলে দিয়েছিল এক সৎ, সুন্দর, প্রেমিক মানুষের হাতে। সেই মানুষটি তাকে দিয়েছিল তার নাম, তার পরিচয়।

—সে এখন কোথায় অহনা, জানলার দিকে মুখ রেখে কস্তুরী জিজ্ঞাসা করেন।

—আমার মুখের কথায় বিশ্বাস করার দরকার নেই, বিজ্ঞান এখন অনেকদূর এগিয়ে গেছে। সুমন, তোমার অহনা আর মিসেস সান্যালকে নিয়ে চল কোন আধুনিক ল্যাবে, যেখানে জিন টেস্টে ধরা পড়বে, হ্যাঁ সুমন, নিশ্চিত ধরা পড়বে, ঐ মহিলাই তোমার অহনার গর্ভধারিনী।

বজ্রপাতের তীব্র আওয়াজ না, একটি পুরুষ আর একটি নারী কণ্ঠের যুগপৎ আর্তনাদ শোনা গেল মাত্র একটি ধ্বনিতে না-আ-আ…

।। আঠার ।।

প্রিয় অহনা,

এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ে যাচ্ছে রাজা অয়দিপাউসের নিস্ঠুর নিয়তি। জীবনের পরিহাস তাঁকে বাধ্য করেছিল মাতৃ-সহবাসে। এতদিন আমি নিয়তি এবং ভাগ্য এসব নিয়ে মাথা ঘামাতাম না। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে অদৃশ্য কোন পুতুলঅলার অসাবধানী সুতোর টানে আমরা সবাই এক জটিল আবর্তে আটকে গেছি। মনে প্রাণে তোমাকে ভালোবেসেছিলাম। তোমাকে ছাড়া অন্য কারো কথা ভাবিনি। অথচ সেই তুমি আমাকে কোন কারণ না জানিয়ে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলে। কেন সেদিন সংকোচ ঝেড়ে বলনি তুমি অবৈধ সন্তান। এটা আমার কাছে কোন ফ্যাক্টরই ছিল না। কিন্তু নিয়তির অদৃশ্য পাশার চালে ঘটনাচক্রে তুমি এক দিকে আমার প্রেমিকা। অন্যদিকে তোমার মা আমার শয্যা-সঙ্গিনী।

সমাজ নয়, অনুশাসন নয়, বিবেক। কোন যুক্তি তর্কেই এই দুই অদ্ভুত সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখার কোন ক্ষমতাই আমার নেই। আমার সংস্কারাচ্ছন্ন বিবেক বলছে, এ অন্যায়, এ পাপ। আমি চলে যাচ্ছি অহনা, তোমাদের দু'জনের থেকে অনেক দূরে। অয়দিপাউসের মতো নিজের চোখ দুটো কানা করে নয়। অয়দি-পাউসের সময় আমরা অনেকদিন আগে ফেলে এসেছি। তাই বলছি, কোন পাপ বোধে নয়। নিজের অজান্তে, অনিচ্ছাকৃত অপরাধকে আমি পাপ বলিনা। তবে তোমাদের মা আর মেয়ের জীবনকে আরো জটিল না করে সংসারের এক অভাগা মেয়ে, যে আমাকে ভালবেসে আমার মুখ চেয়ে বসে আছে তাকে নিয়ে চলে যাচ্ছি। যদি কোন সুকর্মে আত্মগ্লানি ভুলতে পারি।

ইতি তোমার সুমন

চিঠিটা পড়ার পর অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল অহনা। একবার তাকালো সামনের দোতলার অ্যাপার্টমেন্টে। বুকটা

একবার হু হু করে উঠল। সুমন চলে গেছে। সুনন্দা আর মাকে নিয়ে। যাবার সময় দেখা করেনি। কখন গেছে তাও সে জানেনা। কস্তুরীর ঘরে কেবল সেই প্রবল আর্তনাদে 'না' শব্দ উচ্চারণ করেই সুমন ছুটে পালিয়ে এসেছিল। আশ্চর্য হয়ে একবার কস্তুরীকে জিজ্ঞেস করেছিল, ও চলে গেল কেন? কী হয়েছে ওর?

উত্তরে কস্তুরী বলেছিলেন, তুমি এখন যাও অহনা। শুধু একটা রাত, আমাকে নিজের সামনে একবার দাঁড়াতে দাও। তারপর তোমার সব প্রশ্নের জবাব দেব।

অহনা চলে এসেছিল। তারপরই এই চিঠি। ঠিক দুদিন পর। চিঠি পড়া শেষ হলে তার চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছিল। সুমন নেই। সুমন চলে গেছে। ঠিক সেই একই কারণে হারিয়ে পাওয়া মায়ের কাছেও সে সহজ হয়ে উঠতে পারবে না।

—এতো কী ভাবছিস মা, অবনী যেন কখন এসে পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন। ওঁকে দেখেই অহনা, যা বড় হয়ে কোনদিন করেনি, অবনীমোহনকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, বাবি, সারাজীবন তো তুমি চেয়েছিলে নিগৃহিত মানুষের মুক্তি। সারাজীবনই তো মানুষকে ভালবেসেছ। আচ্ছা বাবি, মানুষ ছাড়া কী মানুষ বাঁচতে পারেনা?

অবনীমোহনের দৃঢ় জবাব, বোধ হয় না। জীবন তো প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে নয়। মানুষ যে প্রকৃতিরই অংশ। তুই গিয়েছিলি মিসেস সান্যালের বাড়ি?

—হ্যাঁ।

—কী বললেন?

—অনেক কিছু। সে তোমায় পরে কোনদিন বলব। বাবি, চল আমরা এখান থেকে কোথাও চলে যাই।

—সেকি? এত সস্তা ভাড়ায় আর কোথায় কী পাব? সুমন কী বলছে?

—সে তো নেই, চলে গেছে।

—কোথায়?

—তার অসহায়, বিধবা দাদার স্ত্রীকে বিয়ে করে সে নতুন ভাবে বাঁচতে চায়।

অবনীমোহন ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, বুঝলাম। কোথায় যেতে চাস মা?

—এমন কোথাও, যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের কোন জটিল সম্পর্ক নেই।

—জানিনা এমন কোথাও কোন দেশ আছে কিনা। মানুষ থাকলেই সম্পর্ক কখনো জটিল হবে, কখনও সুন্দর হবে। এইসব নিয়েই তো সমাজ, সংসার, প্রকৃতি। ঠিক আছে মা। তোর অবস্থা বুঝতে পারছি। বেশ, তাই হবে। চল মা বেটায় কোথাও চলে যাই। আমি ভাবছি শিউলির কথা।

—আমি জানি বাবি, শিউলি মাসীকে তুমি ভালবাস। বেশতো, তাকেও নিয়ে চল।

—না মা, তাহলে যে ভালবাসার মাধুর্যটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

কিন্তু মাসী যে বড় একলা হয়ে যাবে।

—তোর মাসী চিরদিনই একলা। দোকলা হবার জের হয়তো টানতে পারবে না। চল, তাই চল, কোন শান্ত নির্জন পৃথিবীতে। আমারও আর ভালো লাগছে না এখানে থাকতে।

* * *

মিসেস সান্যাল,

আমি চলে যাচ্ছি। আমার বাবিকে নিয়ে। কোথায় জানিনা। একটা শান্তনা। আমি অবৈধ জারজ সন্তান নই। আর হলেই বা কী? এতদিনে আমি বিশ্বাস করি, আজকের পৃথিবীতে জারজ শব্দটাই অর্থহীন। সবারই কোথাও না কোথাও বাবা-মা আছে। কেউ পায়,কেউ পায় না। আসলে আমরা সবাই মানবসন্তান, এটাই আমাদের পরিচয়। এ জীবনে মায়ের আদর হয়তো পেলাম না। কিন্তু সন্তানের জন্যে তাঁর আকুতি তাঁর ঐকান্তিক কনফেশান, তাঁর সম্বন্ধে আমার সব ধারণা বদলে দিয়েছে। তবে আমাদের তিনজনকে নিয়ে ভাগ্যের যে নিষ্ঠুর খেলা হয়ে গেল, তা কারো কোন পাপ নয়। আমরা এক জটিল সম্পর্কে জট পাকানো সুতো। যে জট কোনদিনও কোন মানসিকতায় আলগা হবে না। আমিই কী পারব খোলা মনে আপনাকে 'মা' ডাকতে নাকি আপনিও যে আকুল কামনায় আমাকে পেতে চেয়েছিলেন সে আকুলতা আর থাকবে? আমাদের দুজনের মাঝে সুমন না থাকলেও এক বিশ্রী

উপস্থিতির স্মৃতি চিরদিনই দেওয়ালের মতো আড়াল সৃষ্টি করে রাখবে। তার থেকে এই ভাল। এই জটিল সম্পর্কের পথটা যদি তার নিজের খেয়ালে তিন দিকে চলে যায়, যাকনা।

ইতি, আপনার হতে পারতো, এই অহনা।

নিশুতি রাতের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কস্তুরী সান্যাল তাকিয়ে আছেন কালো আকাশের বুকে চিকচিক করা তিনটে তারার দিকে চেয়ে। তিনটে তারাই তিনমুখো। কস্তুরী ভাবলেন, অনন্তকালেও ওরা কেউ কারো আবর্তে কোনদিনও আসবে না। এলেই সংঘর্ষ অনিবার্য।

সুমনের দেওয়া অহনার চিঠি, অহনার লেখা কস্তুরীর চিরকুট দুটো কখন যেন কস্তুরীর হাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে বাগানের মধ্যে ছড়িয়ে গেল। টুকরোগুলো মিলেমিশে এমনভাবে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ল যারা আর কোনদিনও একত্রিত সমাবেশেও অর্থবহ হয়ে উঠবে না।

———